বিদেশী মেম

কাসেম বিন আবুবাকার

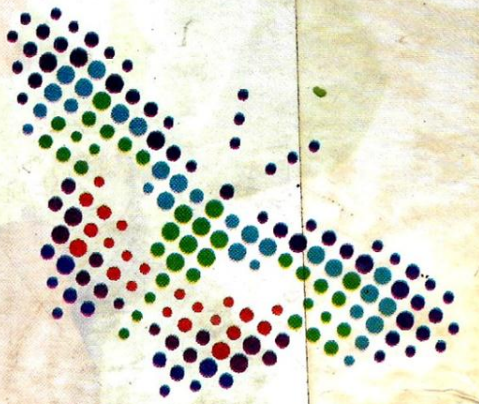

"যখন মানুষ আল্লাহ্‌কে ভয় ক'রতে শেখে তখন তার অন্তরে কোন মানুষের ভয় থাকতে পারে না।"

– ইব্‌নে সিনা

"তিন ব্যক্তির নিন্দা করলে তা গীবৎ বলে গন্য হয় না
১. লোভী ও ইন্দ্রীয়পরায়ন, ২. সর্বদা পাপ কার্যে লিপ্ত,
৩.অত্যাচারী নেতা।"

– হাসান বসরী (রাঃ)

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

একদিন ঢাকার সাইন্স ল্যাবরেটরীর মোড়ের বায়তুল মামুর মসজিদে মাগরিবের নামায পড়ে বেরোবার সময় একজন অপূর্ব সুন্দরী বিদেশীকে মসজিদের ভিতর ষ্ট্যাচুর মত বসে থাকতে দেখে কিছু লেখার প্রেরণা অনুভব করি।

এ উপন্যাসখানি তারই ফসল। এর কাহিনী আমার সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যদি কারো জীবনের সঙ্গে এর কিছু অথবা সম্পূর্ণ মিলে যায়, তবে আমি তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

ওয়াস্‌সালাম

তারিখ ঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ ইং

পৌষ মাস, কনকনে শীত। তার উপর গতকাল এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ফলে শীতের প্রকোপ আরও বেড়ে গেছে। সেই শীতের গভীর রাতে রফিক দ্রুত হেঁটে চলেছে বাসার দিকে। তার দোহারা গড়ন সুঠামদেহ ও টকটকে ফর্সা চেহারা যে কোনো নারী-পুরুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে পাশ করে সে একটা হাইস্কুলে চাকরি করছে। তার সুনাম শুনে জেলা জজ আজমল সাহেব তাঁর একমাত্র পুত্র নজরুলের জন্য তাকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছেন।

নজরুলের বাসা ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায়, আর রফিকের বাসা সেগুনবাগিচায়। সেদিন নজরুলকে পড়াতে পড়াতে রাত হয়ে গেল। পড়ান শেষ করে রফিক যখন রাস্তায় নামল তখন রাত বারোটা। বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। দু'একটা রিক্সা তাদের আস্তানার দিকে ফিরে যাচ্ছে। ধানমণ্ডি থেকে সেগুনবাগিচায় অত রাতে কোনো রিক্সা যেতে চায় না। যাও বা দু-একজন রাজী হয়, ভাড়া শুনে রফিক পিছিয়ে যায়। অগত্যা যখন কোনো ব্যবস্থা হল না, রফিক তখন শ্রীরচণ ভরসা করেই হাটা শুরু করল।

শরীরকে গরম রাখার জন্য সে দ্রুত হাঁটছে। কপালে তার চিন্তার রেখা, যদিও সে বিত্তহীন, তবু তাকে আরো লেখা পড়া শিখতে হবে। তাই সে স্কুলের শিক্ষকতা আর টিউনসী করেও লেখাপড়া করতে চায়। এভাবে কি সে তার লক্ষে পৌঁছাতে পারবে? এটাই চিন্তার বিষয়বস্তু।

শাহবাগের চৌরাস্তা পেরিয়ে সে শিশুপার্কের ফুটপাত ধরে আসছিল। কিছুদূর আসার পর দেখল, একটা প্রাইভেট কার রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, আর ড্রাইভার গাড়িটাকে ষ্টার্ট দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু ষ্টার্ট নিচ্ছে না। রফিক ভাবল, লোকটা বিপদে পড়েছে। সে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

শীতকাল বলে গাড়ির সব দরজরা কাচ বন্ধ। শুধু ড্রাইভারের দিকের অল্প একটু খোলা। রাস্তার আলোতে দেখতে পেল, ড্রাইভার একজন বিদেশিনী। তার পাশে যিনি সীটে হেলান দিয়ে গভীর ঘুম আচ্ছন্ন, তিনি একজন বাঙালী। লোকটাকে দেখে বিত্তবান বলে রফিকের মনে হল।

একটা লোককে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে বিদেশিনী বলল, প্লীজ হেল্প মি। তাকে পাশের লোকটির দিকে চাইতে দেখে বিদেশিনী আবার বলল, হি ইজ সীক, প্লীজ হেল্প মি।

রফিক কোন কথা না বলে গাড়িটা ঠেলতে লাগল। কিন্তু বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরও ষ্টার্ট নিল না। এদিকে রফিক শীতের মধ্যেও ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেল। শেষে বিদেশিনীকে বলল, প্লীজ কাম আউট, লেট মি ট্রাই টু ষ্টার্ট দি কার। বাঙালী যুবকের মুখে ইংরেজী কথা শুনে তাকে ভদ্র ও শিক্ষিত মনে করে আশ্বাস্ত হয়ে নেমে দাঁড়াল।

রফিক গাড়িতে উঠে পেলাস, এ্যাকসেলারেটার ও গীয়ার পরীক্ষা করে ষ্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সফল হল না। তখন সে গাড়ি থেকে নেমে ইঞ্জিনের হুড খুলে দোষ ধরে ফেলল। তারপর ঠিক করে দিয়ে বলল, নাউ ষ্টার্ট দা কার, অল আর ওকে।

বিদেশিনী এতক্ষণ অবাক হয়ে বাঙালী যুবকটির কার্যকলাপ দেখছিল। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়েই বুঝতে পারল, সব ঠিক আছে। ভ্যানিটী ব্যাগ থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করে জানালা দিয়ে বাড়িয়ে বলল, প্লীজ টেক ইট।

রফিক নো, থ্যাংকস বলে হাঁটা শুরু করল।

বিদেশিনী কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে চিন্তা করতে লাগল, পারিশ্রমিক হিসাবে যুবকটি টাকাটা নিতে পারত। বাঙালীদের মধ্যে তাহলে ভালো লোকও আছে। ভুল করে ফেললাম, যুবকটির পরিচয় নেওয়া উচিত ছিল।

একসময় বিদেশিনী গুলশানের একটি বাড়িতে এসে পৌঁছাল। দারোয়ান গেট খুলে দিলে সে গাড়ি বারান্দায় গিয়ে পার্ক করল।

বুড়ো চাকর জাব্বার এসে গাড়ির দরজা খুলে তারপর সে ও বিদেশিনী দু'জনে মিলে গাড়ির ভিতরের সেই ঘুমন্ত লোকটিকে ধরে বেডরুমে নিয়ে গেল।

ফেরার পথে রফিক বিদেশীনির কথা চিন্তা করছিল। সে অনেক বিদেশী মেম সাহেব দেখেছে। তাদের শুধু গায়ের রংটাই যা ফর্সা। দৈহিক গঠন ও ফেসকাটিং কারুর ভালো নয়। কিন্তু আজকের এই মেম সাহেবকে দেখে সে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল। মেয়েটির ফিগার ও মুখের অবয়ব দেখে তার মনে হয়েছে, জীবনে আজ পর্যন্ত সে যত দেশী ও বিদেশী মেয়ে দেখেছে, তাদের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। আর তার গলার আওয়াজ কত মধুর, কত মোলায়েম। অবশ্য বিদেশী সাহেব ও মেমেরা কথা বলার সময় ভদ্রভাবে মোলায়েম সুরে কথা বলে থাকে। তবু এই সাহেবের চেয়ে মেম সাহবেকে তার ব্যতিক্রম বলে মনে হল। তার পাশে বসা বাঙালী সাহেবের চেয়ে মেম সাহেবর বয়স অনেক কম। বিদেশী মেয়েদের মনের রুচীর কথা চিন্তা করে তাদের প্রতি তার ঘৃণা জন্মাল। ভাবল, সব মেম সাহেবরা কি এ রকম হয়? তারা কি শুধু টাকা, গাড়ি, বাড়ি ও ঐশ্বর্য্যকে ভালবাসে? সেখানে কি মন নিয়ে কেউ কারবার করে না?

বাসায় ঢুকবার আগে হঠাৎ রোকেয়ার কথা মনে পড়তে তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

কুলসুম বিবি ছেলের অপেক্ষায় এতক্ষণ না খেয়ে জেগে বসে ছিলেন। রফিককে দেখে বললেন, এত দেরি হল কেন? আমি এদিকে ভেবে মরছি রাস্তায় কোনো বিপদ হল কিনা।

রফিক বলল মা, তুমি শুধু শুধু চিন্তা কর। আমার কিছু হয়নি। পড়াতে পড়াতে আজ একটু বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল। বাস পেলাম না, তাই হেঁটে আসতে দেরি হয়ে গেল। তুমিও না খেয়ে জেগে আছ? কতদিন না তোমাকে বলেছি, সময় মত খেয়ে শুয়ে পড়বে। আমি যখন ফিরব তখন খেয়ে নেব। তুমি যদি আমার কোনো কথা শোন।

কুলসুম বিবি বললন, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে আয়, আমি ভাত বাড়ছি।

রফিকদের বাড়ি ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ীতে। তার বাবা কেরামত আলী ছিলেন একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তাদের জমি-জায়গা নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। কেরামত আলী ছিলেন স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ ও ধর্মপরায়ন। তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাঁর কাছে সাহায্য ও ধৈর্য্য ধরার শক্তি চেয়ে আমরণ পরিশ্রম করে সংসার চালিয়ে গেছেন।

রফিকরা দুই ভাই, দুই বোন। রফিক যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে তখন দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে। গ্রামের অনেকের সঙ্গে রফিকের ছোট ভাই ও দুই বোন এবং তার বাবা দুই তিন মাসের ব্যবধানে মারা যান।

কুলসম বিবি এগার বছরের রফিককে নিয়ে অকুল সাগরে ভাসলেন। রফিকের চাচারা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা কেউ কুলসুম বিবিকে ভালো চোখে দেখত না। কারণ যে বছর কুলসুম বিবিকে কেরামত আলী বিয়ে করে নিয়ে আসেল, সেই বছর থেকে তাদের জমি-জায়গা নদীতে ভাঙতে শুরু হয়। কুলসুম বিবিকে তাদের পরিবারের সবাই অপয়া মেয়ে মনে করতে থাকেন। আর কেরামত আলীকে ঐ বৌকে তালাক দিয়ে আবার বিয়ে করতে বলেন।

ধর্মভীরু কেরামত আলী তাদের কথায় কিছুতেই রাজী হন না। উপরন্ত আত্মীয়-স্বজনকে হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "বিনা দোষে স্ত্রীকে তালাক দিলে গোনাহ হবে। 'হাদিসে' আল্লাহর রসূল (দঃ) বলেছেন, সমস্ত হালাল জিনিষ আল্লাহর কাছে প্রিয় একমাত্র তালাক ব্যতীত।"

ভাইয়েরা তাকে বাগে আনতে না পেরে নদীর ধারের জমিগুলো তাকে দিয়ে আলাদা করে দেন। পরে যখন সব জায়গা-জমি নদীতে ভেঙ্গে যায়-তখনও তারা ভাইকে অনেক বুঝিয়েছেন অনেক ভয়-ভীতি দেখিয়েছেন। কিন্তু কেরামত আলী তাদের কথা শোনেননি। এখন তারা কুলসুম বিবিকে আরও বেশী অপয়া ভেবে কোনো সাহায্য করলেন না।

কুলসুম বিবির বাপ ভাই কেউ নেই। চাচার কাছে মানুষ। সেই চাচাই তার বিয়ে দিয়ে দেয়। কুলসুম বিবি দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। কেরামত আলীর বড় ভাই তাই তাকে একরকম বিনা যৌতুকে ভদ্র বৌ করে ঘরে এনেছিলেন। কুলসুম বিবির চাচা-চাচী মারা গেছেন। চাচাতো ভাই-ভাবিদের কাছে গিয়ে তাদের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা খাওয়ার চেয়ে স্বামীর ভিটেয় তরী-তরকারী ফলিয়ে, পাড়ার লোকের বাড়িতে কাজ করে ছেলেকে মানুষ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন।

রফিক ছেলে বেলা থেকে পড়াশুনায় খুব ভালো। কিন্তু ভীষণ ডানপিটে। অন্যায় ভাবে তাকে কেউ কিছু বলে পার পেত না। পাড়ার ছেলেরা তো বটেই, এমনকি বড়রা পর্যন্ত তাকে মনে মনে ভয় করত। কারণ যে কেউ কোনো অন্যায় কাজ করলে, রফিক তার কথা পাড়ায় ও গ্রামে প্রচার করে দিত। সেই দুরন্ত রফিক তার বাবা মারা যাওয়ার পর শান্তশিষ্ট হয়ে গেল। পাড়ায় কারুর সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করত না। শুধু পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সংসারের দুরাবস্থা তার কচিমনে দাগ কাটে। সে নিচের ক্লাসের ছাত্রদের প্রাইভেট পড়িয়ে নিজের পড়ার খরচ চালাতে লাগল। আর কুলসুম বিবি পাঁচটা পাঁচ রকম করে নিজের ও ছেলের পেটের অন্ন জোগাড় করতেন। কতদিন যে তারা দুবেলা পেটপুরে খেতে পায় নি, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

এভাবে রফিক এস, এস, সি পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করল। তারপর সে মাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঢাকায় কাজের চেষ্টায় এল। তার ইচ্ছা যে কোনো কাজ পেলে পড়াশুনাও চালিয়ে যাবে। ঢাকা আসার পথে ভাগ্যচক্রে বাসে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তার বাড়ি রফিকদের গ্রামের পাশের গ্রামে। উনি রফিকদের বাপ-দাদাদের চেনেন। ঢাকায় ব্যবসা করেন। সেখানে ছোটখাট একটা বাড়িও করেছেন।

রফিকের কাছে তাদের সংসারের বিপর্যায়ের কথা শুনে তিনি তাকে ঢাকায় নিজের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের পড়াবার পরিবর্তে লজিং দিলেন।

তাদের বাড়িতে থেকে রফিক অন্য জায়গায় আরও কয়েকটা ছেলেকে প্রাইভেট পড়িয়ে মাকে কিছু পাঠিয়ে বাকিটা জমাতে লাগল। পরের বছর সে কলেজে ভর্তি হল। দিনরাত পরিশ্রম করছে পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে সে ইংলিশে অনার্স নিয়েছে। বর্তমানে একটা

হাইস্কুলে মাষ্টারী করছে এবং কয়েকটা টিউশনীও করছে। হঠাৎ মায়ের অসুখের খবর পেয়ে সে দেশে যায়। মা একটু সুস্থ হলে তাকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসে। কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে সে ড্রাইভিং ও মটর মেকানিক্সের কাজও শিখেছে।

হাত মুখ ধুয়ে এসে মাকে ভাত বেড়ে বসে থাকতে দেখে রফিক বলল, তুমি খাওনি বসে রয়েছ? নাও খাও বলে সে খেতে আরম্ভ করল।

খাওয়া শেষ করে কুলসুম বিবি জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, তোদের স্কুলে কি গোলমাল চলছিল বলেছিলি, মিটে গেছে?

রফিক বলল, কই আর মিটল, সেক্রেটারীও আমাকে রাখতে চায় না, হেড মাষ্টারের সাথে হাত মিলিয়েছে।

কুলসুম বিবি বললেন, তুই স্কুলে ছেলে পড়াতে যাবি, তাদের কোনো ব্যাপারে কথা বলতে যাস কেন?

মা, তুমি কিছু জান না। স্কুলের উন্নয়নের জন্য সরকার অনেক টাকা মঞ্জুর করেছিল, তার সিকি ভাগ খরচ করে বাকিটা সবাই মিলে আত্মসাৎ করেছে। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম বলে কেউ আমাকে রাখতে চায় না। দু-একদিনের মধ্যে হয়তো আমাকে বরাখস্ত করবে।

কুলসুম বিবি বললেন, আজকাল শিক্ষিত লোক হয়ে, বিশেষ করে যারা মাষ্টার তারও যদি সরকারের টাকা মেরে খায়, তাহলে দেশ টিকবে কি করে? আর সেই সব চরিত্রহীন শিক্ষকদের কাছে ছেলেরা কি শিক্ষা পাবে? তারা তোকে বরখাস্ত করার আগে তুই ঐ চাকরি ছেড়ে দে। আল্লাহ রিযিকদাতা তিনি আর একটা জুটিয়ে দেবেন।

তুমি ঠিক বলেছ মা। আমি কালই কাজে ইস্তফা দেব।

পরের দিন রফিক একটা রেজিগনেশান লেটার লিখে হেড মাষ্টারের হাতে দিয়ে চলে এল। ফেরার পথে বন্ধু আবিদের কথা মনে পড়তে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য নিউমার্কেটের দিকে রওয়ানা দিল।

আবিদ নিউমার্কেটে তার দুলাভাইয়ের বইয়ের দোকানের ম্যানেজার। কলেজে পড়ার সময় দ'জনের বন্ধুত্ব হয়। সময়ে অসময়ে সে রফিককে টাকা দিয়ে অনেকবার সাহায্য করেছে। অবশ্য রফিক পরে তা শোধ করে দিয়েছে। তাদের বাসায়ও সে কয়েকবার গিয়েছে।

অনেক দিন পর রফিককে দেখতে পেয়ে আবিদ আগে সালাম দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, কেমন আছিস দোস্ত? খালাআম্মা ভালো আছে?

রফিক সালামের জওয়াব দিয়ে বলল, আল হামদুলিল্লাহ। সব ভালো, তবে আজই চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে এলাম।

আবিদ খুব আশ্চার্য হয়ে বলল, কি বললি? এই দু'দিনে কেউ চাকরি ছাড়ে? মাষ্টারীতে তো বেশ নাম করেছিলি। কি এমন হল যে জন্য চাকরি ছেড়ে দিল?

রফিক হাসতে হাসতে বলল, তুই এত আশ্চার্য হচ্ছিস কেন? কেন ছাড়লাম তার কারণটা বলছি শোন। তারপর কারণটা খুলে বলল।

লাইব্রেরীটা খুব বড়। ওরা এক পাশে কথা বলছিল। আর অন্যপাশে একজন বিদেশিনী আগে থেকে কাউন্টারের উপর কয়েকটা কমার্সের বই দেখছিলেন। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে রফিকের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলেন, গত রাতের সেই যুবক। যে তার গাড়ি ঠিক করে দিয়েছিল। সদ্য চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে এসে কেউ এরকম হাসতে পারে, তা তার জানা ছিল না। রফিককে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী ছেলে মনে করলেন। একটা বই হাতে করে

এসে আবিদকে মেমো করে প্যাকেট করে দিতে বললেন। তারপর রফিককে লক্ষ্য করে বললেন, হ্যালো, হাউ আর ইউ? তারপর হ্যাণ্ডসেফ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

রফিক প্রথমে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। পরক্ষণে মেমসাহেবকে চিনতে পেরে হ্যাণ্ডসেক না করে বলল, এক্সকিউজ মি, দিস ইজ নট ইসলামিক কাষ্টম। লেট ইট, আই এম ওয়েল এণ্ড হোয়াট এ্যাবাউট ইউ?

মেম সাহেব চিন্তাই করতে পারেনি, কেউ তার অফার করা হ্যাণ্ডসেককে ডিনাই করতে পারে! তার জীবনে এই প্রথম দেখল। তাদের সমাজের এবং তার স্বামীর এই বাঙালী সমাজের লোকেরা তার সঙ্গে হ্যাণ্ডেসেক করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করে। আর এই যুবক যা কেউ কোনো দিন করেনি তাই করল। সে খুব অপমান বোধ করল। কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, ওকে থ্যাংক ইউ, তারপর দাম দিয়ে বইটি নিয়ে চলে গেল।

মেম সাহেব চলে যাওয়ার পর আবিদ বলল, দোস্ত, কী ব্যাপার বলতো? ম্যাডামের সঙ্গে তোর পরিচয় হল কি করে? বেচারী খুব মাইণ্ড করেছে। তুই তার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করলি না কেন?

রফিক বলল, তা করতে পারে, তাতে আমার কি? তার সঙ্গে পরিচয় ঠিক হয় নি। গত রাতে গাড়ি খারাপ হয়ে রাস্তায় স্বামী-স্ত্রী আটকা পড়েছিল। আমি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। গাড়িটা সারিয়ে দিই। ব্যস ঐ পর্যন্ত, তবে মজুরী বাবদ একশো টাকা দিতে চেয়েছিল। আমি নিই নি।

আবিদ বলল, যাই বলিস, মেম সাহেব কিন্তু তোকে খুব দাম্ভিক ও অভদ্র মনে করে গেল।

দুর ওঁর কথা বাদ দিয়ে বল, আমার স্বামী সোহাগিনী ভাবি কেমন আছেন?

ভালো আছে।

তা তোদের বাচ্চা-কাচ্চা হল? না এখনো আটকে রেখেছিস? আবিদকে মৃদু মৃদ হাসতে দেখে আবার বলল, আর কত দিন আটকে রাখবি? এটাতো ইসলামের দৃষ্টিতে সরাসরি অন্যায়। শেষে দেখিস আবার না পস্তাতে হয়। যখন সন্তান চাইবি তখন আর হবে না।

দেখ রফিক, আমাকে তো তুই চিনিস। আমি তোর ভাবিকে ট্যাবলেট খেতে অনেক নিষেধ করেছি। বলি বুড়ো বয়সে ছেলে মেয়ে হলে মানুষ হওয়ার আগেই যদি দুনিয়া থেকে চলে যাই, তবে তাকে মানুষ করবে কে? আর বুড়ো বয়সে ছেলে যদি বাপকে সাহায্য না করতে পারল, তবে অমন ছেলে-মেয়ের দরকার কি। আরও কত কি বলে যে বোঝাই তার ঠিক নেই। কিন্তু সে আমার কোনো কথায় মোটেই কান দেয় না। ঐ যে একটা কথা আছে, "চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী" ঠিক তাই। আমার কথা শুনে বলে, এত কম বসয়ে ছেলেপুলে হলে শরীরের গ্লামার নষ্ট হয়ে যাবে। তখন তুমি আবার আমাকে ফেলে অন্য মেয়ের পিছনে ঘুরবে।

রফিক বলল, তোদের দু'জনকে ইসলামিক বই পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। তোর এত লেখাপড়া করলি কিন্তু ধর্মীয় কোনো বই পত্র না পড়ে আসল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলি। তাই বলি, হায়রে দুনিয়ার মুসলমান, বিধর্মীদের কাছে শত লাঞ্চিত ও অত্যাচারিত হয়েও জ্ঞান ফিরল না। যারা অত্যাচার, উৎপীড়ণ ও লাঞ্ছিত করছে গোটা মুসলিম জাতিকে,

নির্লজ্জা ও কাপুরুষের মত আবার তাদের প্রচলিত পথে চলেছে। যদি বিধর্মীদের পথ ত্যাগ করে ইসলামী তাহজিব ও তমুদ্দুনের জ্ঞান অর্জন করে সেই পথে চলতো, তাহলে আবার মুসলমানরা উন্নতির চরম শিখরে উঠতে পারতো ইনশাআল্লাহ।

আবিদ বলল, কিন্তু বিধর্মীদের অনেক মতবাদ তো ভালো।

আমি তো বলিনি, বিধর্মীদের সবকিছু খারাপ। একটা কথা জেনে রাখিস, অনেকগুলো জিনিস যদি একসঙ্গে থাকে, তাহলে তার মধ্যে কোনো জিনিসটা ভালো যে বিচার করবে, তাকে পুঙ্খানু-পুঙ্খুকনুভাবে প্রত্যেকটি জিনিসের ভালো-মন্দ পরীক্ষা করতে হবে। আর পরীক্ষা করার জন্য সেই ব্যক্তি উপযুক্ত, যিনি নাকি ঐ সব জিনিসগুলোর সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। ব্যাপারটা কি জানিস, স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েরা ইসলামী তাহজিব ও তমুদ্দীন সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান পায় না। পাবে ও বা কোথায়? জন্মের পর থেকে বাপ-মা দাদা-দাদি ও মুরুব্বিদেরকে শুধু নামায রোযা আর ধনীদের ছেলেমেয়েরা কুরবানী, হজ্ব ও জাকাত দেখে আসছে। তাই তারা মুসলমান বলতে শুধু ঐ সবকে বুঝে। তারপর শিক্ষাঙ্গনে এসে তারা যে সব আদব-কায়দা, আচার-অনুষ্ঠান ও পোশাক-আশাক এবং আইন-কানুন দেখে, সেগুলোর মধ্যে ইসলামের নাম গন্ধ নেই। যা আছে তা শুধু ঐ নামায আর রোযা তার মধ্যে আবার শতকরা নব্বই ভাগ বেনামাযী আর বেরোযাদার। কলেজ-ইউনিভারর্সিটিতে ইসলামের ইতিহাস বলে যে সব বই পড়ান হয়, সেগুলোকে ইসলামের ইতিহাস বললে ভুল হবে। কারণ সেগুলো মুসলমানদের ইতিহাস। ইসলামের ইতিহাস আর মুসলমানদের ইতিহাসের মধ্যে আসমান জমিন তফাৎ। তাছাড়া মুসলমানদের ইতিহাসের যে সব বই পড়ান হয়, সেগুলো আবার বিধর্মীদের লেখা।

আবিদ বলে উঠল কেন? অনেক মুসলমান লেখকরা বইও তো রয়েছে।

তা আমিও জানি। কিন্তু সেই সব মুসলমান লেখকের বিধর্মী এবং যারা ইসলামের দুষমন, সেই সব ইতিহাস বেত্তাদের বই পড়ে ঐ সব বই লিখেছেন। জানিস তো দুষমনেরা যেই হোক, কেউ তারা শত্রুর গুনগান নিশ্চয় করবেন না। যেটুকু শুধু সর্বজনবিদিত, শুধু সেই ভালো দিকগুলো দিয়ে বাকি একটু আধটু দোষকে তিলকে তাল করে এবং তার সঙ্গে বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে বহু মিথ্যা দোষ দেখিয়ে ইতিহাস লিখেছেন। ইতিহাস কোনো দিন মিথ্যা হতে পারে না। এটা তোরা সবাই বলবি। আমিও তোদের কথায় উত্তর দিচ্ছি, যদি তাই হয়, তবে বৃটিশ মিউজিয়ামে মুসলমান লেখকদের লেখা যে ইতিহাস বই রয়েছে, সেগুলোও তাহলে মিথ্যা হতে পারে না। সেই সব ইতিহাস আমাদের দেশে কেন লেখা হয়নি? এর জবাব আজ কে দেবে? কেন বর্তমানের মুসলমান ইতিহাস লেখকরা সেই সব ইতিহাস পড়ে দেখেননি? আমার মনে হয়, শিক্ষা মন্ত্রালয়ের ও অনেক দোষ রয়েছে। তারা যদি কলেজে ইউনিভার্সিটিতে ক্বুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা রাখত তাহলে মুসলমানদের ছেলেমেয়েরা তাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির জ্ঞান পেয়ে বিপথে যেতে পারত না।

কয়েকজন কাষ্টোমার আসতে রফিক বলল, পাগলের মত অনেক কিছু বললাম, এবার চলি দোস্ত। আমার জন্য একটা কিছু দেখিস, কয়েকদিন পরে এসে খোঁজ নেব। তারপর সালাম দিয়ে বলল, আসি, আল্লাহ হাফেক।

আবিদ সালামের জওয়াব দিয়ে কাষ্টোমারের দিকে মনোযোগ দিল।

রফিক গেটে এসে একটা রিকশায় উঠে শেরাটন হোটেলের সামনে যেতে বলল।

মেম সাহেব এতক্ষণ গেটের পাশে গাড়িতে বসে ছিলেন। রফিককে রিকশা নিয়ে যেতে দেখে তাকে ফলো করার জন্য ড্রাইভারকে ইশারা করল।

হোটেল শেরাটনের গেটের বিপরীত দিকে যেখানে ভাড়া ট্যাক্সী ষ্ট্যাণ্ড, সেকানে রফিক রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে ফুটপাতের চা দোকানের দিকে এগোল।

তাকে দেখতে পেয়ে যে ক'জন ড্রাইভার চা খাচ্ছিল, তারা সবাই একসঙ্গে সালাম দিয়ে বলে উঠল, আরে রফিক ভাই যে, কেমন আছেন? এই গরিবদের কথা এতদিন পরে মনে পড়ল?

মেম সাহেব এমন জায়গায় গাড়ি পার্ক করলেন, যেন কারও জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু ড্রাইভারদের ও রফিকের কথা শুনতে পাচ্ছেন। বলা বাহুল্য মেম সাহেব খুব ভালো বাংলা জানেন।

রফিক সালামের উত্তর দিয়ে সকলের সঙ্গে হাত মোসাফা করে বলল, আল্লাহর ফজলে ভালো আছি। তারপর একজন বুড়ো ড্রাইভারের পাশে বসে বলল, কি চাচা, আপনার মেয়ে এখন সুখে ঘর করছে তো?

বুড়ো ড্রাইবার দাড়ী নেড়ে ছল ছল নয়নে বলল, আল্লাহ তোমাকে হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখুক বাবা, তোমার দয়া না পেলে মেয়েটার আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকতো না।

এই বুড়ো ড্রাইভারের মেয়ের নাম রিজিয়া। বর্তমানে বাপ-মার একমাত্র সন্তান। তার এক বড় ভাই ছিল। রিজিয়ার জন্মের পাঁচ বছর আগে মারা গেছে। একমাত্র ছেলের মৃত্যুর পর আল্লাহপাকের দরবারে সন্তানের জন্য অনেক কান্নাকাটি করার পর এই মেয়েটার জন্ম হয়। তাই সে বাপ-মার খুব আদরের ধন। রিজিয়ার বাপ সারা জীবন ঢাকাতে ভাড়া ট্যাক্সী চালায়। রফিকদের গ্রামেরই লোক। আগের থেকে তাকে সে চিনত। তাই যখন সে প্রথমে ঢাকায় আসে, তখন কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে তার কাছেই ড্রাইভিং ও মেকানিক্সের কাজ শিখে। সে তাদের বাসায় প্রায়ই যেত। ইদানিং বেশ কিছুদিন যাইনি।

রিজিয়া সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। ম্যাট্রিক পাশ করার পর কলেজে পড়তে চাইলে তার মা আর পড়াতে রাজী হয়নি। স্বামীকে মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র দেখতে রোজ তাগিদ দেয়। রিজিয়ার বাবা পছন্দ মত ছেলে পায় না। ফলে রিজিয়ার বয়স বেড়ে চলে।

তাদের মহল্লার বড়লোকের একটা ছেলে তাকে বিয়ে করতে চায়। ছেলেটা এই ব্যাপারে একটা চিঠিও রিজিয়াকে দিয়েছিল।

রিজিয়িারও ছেলেটিকে পছন্দ। যদিও সে জানে, ছেলেটার পয়সাওয়ালা বাবা এই বিয়েতে মত দেবেন না, তবু সেও চিঠির দ্বারা তাকে জানিয়েছে বিয়ের ব্যাপারে তোমার বাবাকে আমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলো।

রিজিয়ার চিঠি পেয়ে ছেলেটা তার মাকে দিয়ে বাবার কাছে কথা জানায়। সবশুনে ছেলেটার বাপ ড্রাইভারের মেয়েকে পুত্রবধু করতে রাজী হন নি।

শেষে ছেলেটা রিজিয়াকে জানায়, তারা দুজনে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। রিজিয়া রাজী না হওয়ায় একদিন সুযোগ মত রিজিয়াকে ভয় দেখিয়ে জোর করে নিয়ে পালিয়ে যায়।

পরের দিন রফিক রিজিয়ার বাপারে মুখে ঘটনা শুনে ছেলেটার পরিচয় জেনে নেয়। তারপর ছেলের বন্ধুদের কাছ থেকে খবর নিয়ে নারায়ণগঞ্জে তার খালার বাড়ি থেকে

দু'জনকে খুঁজে বের করে এনে তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়।

ছেলের বাবা প্রথমে খুব আপত্তি করলেও রফিকের যুক্তির কাছে হেরে যান এবং নিজের ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে রিজিয়াকে ঘরে তুলে নেন।

বুড়ো ড্রাইভারের কথা শুনে রফিক বলল, এই তো ভুল করে ফেললেন চাচা, আমি আর কি করেছি, তারপর আকাশের দিকে সাহাদাৎ আঙ্গুল তুলে বলল, যা কিছু করেছেন তিনি। এখন ওসব কথা বাদ দিন, আপনাদের জানাশোনা কোনো গাড়ির ড্রাইভার লাগবে কিনা বলুন। লাগলে আজ থেকেই আমি চালাব।

অন্যরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, সেকি রফিক ভাই, আপনি গাড়ি চালাবেন কেন? আপনিতো স্কুলে মাষ্টারী করেন।

রফিক বলল, মাষ্টারী আজ ছেড়ে দিয়েছি। আপনারা আমার কথা খেয়াল রাখবেন। তারপর চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বুড়ো ড্রাইভার বলল, সে কি বাবা, কিছু না খেয়ে যাবে?

রফিক বলল, আজ থাক চাচা, মা ও দিকে বাসায় চিন্তা করছেন।

সে আরও কিছুক্ষণ বসতো, কিন্তু একটা গাড়ি যে তাকে নিউমার্কেট থেকে ফলো করে এসেছে; এটা সে বুঝতে পেরেছে। তাই কারণটা জানার জন্য না বোঝার ভান করে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটতে লাগল।

রফিক যখন প্রেসিডেন্ট ভবনের গেট পার হয়ে কিছু দূর এসেছে তখন তার পাশে এসে সেই গাড়িটা থামল।

এতক্ষণে সে গাড়ির আরোহীকে দেখতে পেল। সেই মেমসাহেব গাড়ির পিছনের সীটে আর একজন বয়স্ক ধরণের লোক ড্রাইভিং সীটে।

ততক্ষণে মেম সাহেব পাশের দরজা খুলে দিয়া পরিস্কার বাংলায় বলল, উঠে আসুন। আপনি সেদিন আমার অনেক উপকার করেছিলেন। লাইব্রেরীতে শুনলাম, আপনার চাকরি নেই। ড্রাইভারদের কাছেও বলছিলেন ড্রাইভিং করবেন। আমি আপনাকে একটা জব দিতে পারি।

রফিক মেম সাহেবকে পরিস্কার বাংলায় কথা বলতে শুনে বেশ অবাক হল। এক পলক ড্রাইভারের উপর নজর বুলিয়ে নিয়ে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

কি হল? ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? উঠে আসুন, বাসায় পৌঁছে দিই। যেতে যেতে চাকরির কথাটাও বলা যাবে।

রফিক দৃষ্টি সংযত করে বলল, ধন্যবাদ। লিষ্ট দেওয়ার দরকার নেই। তবে চাকরির ব্যাপারে যোগাযোগ করতে পারি।

মেম সাহেবের অন্তর এতক্ষণ রফিকের দৃষ্টির কাছে কাঁপছিল। এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বলল, কখন আসছেন?

রফিক কার্ডটা হাতে নিয়ে বলল, আগামী কাল সকাল আটটায়। তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে হাটতে শুরু করল।

মেম সাহেব কিছুক্ষণ রফিকের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ড্রাইভারকে বাসায় যাওয়ার জন্য ইশারা করল।

হাঁটতে হাঁটতে রফিক মেম সাহেবের কথা চিন্তা করতে গিয়ে তার ছেলেবেলার সাথী রোকেয়ার কথা আবার তার স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠল। যে রোকেয়া তাকে একদিন স্কুলে দেখতে না পেলে পরেরদিন কতবার না আসার কারণ জিজ্ঞেস করত।

রোকেয়ার সঙ্গে প্রথম পরিচয় বৈশাখ মাসের এক ভোর বেলায় তখন রফিকের বয়স মাত্র দশ বছর। সে বছর আমের ফলন খুব ভালো হয়েছিল। কথায় বলে তেতুল ডাকে ধান আর আম ডাকে বান। অর্থাৎ যে বছর তেতুল বেশী ফলে, সে বছর প্রচুর ধান জন্মে। আর যে বছর আম বেশী ফলে, সে বছর ঝড় বৃষ্টি ও বন্যা বেশী হয়।

সেদিন রাতে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল। রফিক ভোরে উঠে আব্বার সঙ্গে মসজিদ থেকে নামায পড়ে এসে বাগানে আম কুড়োতে গিয়েছিল। তাদের বাগানের পাশে রোকেয়াদের বাগান। সেও আম কুড়োতে এসেছিল। তাদের বাগানের পাশে রোকেয়াদের বাগান সেও আম কুড়োতে এসেছিল।

এতদিন রোকেয়া তার মামার বাড়িতে ছিল। তার বয়স যখন চার বছর তখন তার মা মারা যায়। রোকেয়ার আব্বা সোলেমান সাহেব খুব অবস্থাপন্ন লোক। রোকেয়ার আর কোনো ভাইবোন ছিল না। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সোলেমান সাহেব পাশের গ্রামের সুন্দরী রাশেদাকে দ্বিতীয় বিয়ে করেন।

রাশেদা মোটেই রোকেয়াকে দেখতে পারত না। সতীন মেয়ের রূপ দেখে জ্বলে পুড়ে মরত। রোকেয়া ছোট বেলা থেকে খুব সুন্দরী ছিল।

সোলেমান সাহেব তা বুঝতে পেরে মেয়ের ভবিষ্যৎ ও সংসারের অশান্তির কথা চিন্তা করে রোকেয়াকে তার নানির কাছে রেখে আসেন। নানি মারা যাওয়ার পর সোলেমান সাহেব কয়েকদিন হল নিজের কাছে এনেছেন।

এতদিন রাশেদারও কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। সে এখন রোকেয়াকে ভালবাসে, আদর যত্ন করে। রোকেয়াও তাকে আপন মায়ের মতো দেখে। সোলেমান সাহেব এইসব দেখে শান্তি অনুভব করেন। তিনি মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন।

রফিক যখন ক্লাস সিক্সে পড়ে তখন রোকেয়ার সাথে তার কোন পরিচয় হয়নি। সেই ঝড়ের রাতের ভোর বেলায় আম কুড়োতে গিয়ে দুজসের মধ্যে ঝগড়া হয়।

একটা বড় আম রোকেয়াদের বাগানের বেড়ার বাইরে পড়েছিল।সে দিকে রফিকদের একটা আমাগাছ আছে। রফিক নিজেদের গাছের আম জেনে কুড়িয়ে নিল।

ঠিক সেই সময় বাগানের ভিতর থেকে রোকেয়া বলে উঠল, এই ছেলে, আমটা তো আমাদের গাছের, তুমি নিলে কেন?দাও আমাকে দিয়ে দাও।

রফিক বলল, বারে এটা তো আমাদের ফজলি গাছের আম।তারপর আমটা দেখিয়ে বলল, দেখছনা এটা ফজলি আর্ম। এদিকে তো তোমাদের গোপাল ভোগ আমের গাছ।

রোকেয়া আমটার দিকে একবার চেয়ে উত্তর দিতে না পেরে রেগেমেগে বলল, ওটা আমাদেরই গাছের আম, পরের জিনিস নিতে তোমার লজ্জা করে না।

এতটুকু মেয়ের মুখে এই কথা শুনে রফিক বলল, তুমি কে বলতো? তোমাকে তো আগে দেখিনি।

রোকেয়া তখন ঝগড়ার কথা ভুলে গিয়ে বলল,আমি সোলেমান সাহেবের মেয়ে। এতদিন নানির বাড়িতে ছিলাম। কয়েকদিন হল এসেছি। এবার থেকে এখানে থাকবো।

রফিক বাগানের বেড়ার কাছে তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, দেখ না আসলে এটা আমাদের গাছের। তবে তুমি যদি নিতে চাও নাও। রোকেয়াকে চুপ করে থাকতে দেখে রফিক আমটা তার হাতের কাছে ধরে আবার বলল, কই নাও। আচ্ছা আমটা না হয় তেমাদের গাছের। হলো তো? এবার নাও।

রোকেয়া আমটার দিকে চেয়ে বলল, আমারই ভুল হয়েছে, ওটা আমাদের গাছের আম নয়, তোমাদের গাছের।হলো তো? এবার নাও।

রফিক বলল, হলই বা আমাদের গাছের, তবু তুমি নাও। আমি খুশী মনে তোমাকে দিচ্ছি।

রোকেয়া রফিকের দিকে একবার চেয়ে আমটা নিল।

রফিক জিজ্ঞেস করল, তেমার নাম কি?

রোকেয়া। তোমার ?

রফিক।

তারপর স্কুলে দেখা। রপিকের বাবা মারা যাওয়ার পর সে রোকেয়াকে সারা স্কুল জীবন প্রাইভেট পড়িয়েছে। তাকে পড়িয়ে টাকা নিতে রফিকের মন চাইতো না কিন্তু নিজের পড়ার খরচের জন্য নিতে বাধ্য হত। বড় হয়ে সে কথা রোকেয়াকে একদিন বলেছিল।

রোকেয়া তখন জিজ্ঞেস করেছিল, কেন টাকা নিতে মন চায়নি?

রফিক কয়েকমুহূর্তে মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলেছিল, সত্যি করে বলতো, তুমি কি এর উত্তরটা জান না।

কথাটা শুনে রোকেয়া খুব লজ্জা পেয়ে কোনো কথা বলতে পারেনি

রফিক যখন ঢকায় কাজের ও পড়াশুনার চেষ্টায় চলে আসবে তখন আসার আগেরদিন রোকেয়া রফিককে বলল, তুমি একদিন আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলে, সেদিন লজ্জায় আমি উত্তর দিতে পারিনি। গতরাত্রে যখন আব্বার মুখে শুনলাম, তুমি ঢাকায় চলে যাচ্ছতখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলামনা। রফিক ভাই, একটা কথা মনে রেখ, ছেলেবেলায় তোমাকে খুব ভাল লাগত। আর জ্ঞান হওার পর থেকে তুমি আমার তনু মনুতে রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। আমি মেয়েছেলে হয়েও বেহায়ার মত না বলে থাকতে পারলাম না। রফিককে ছলছল নয়ণে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রোকেয়া আবার বলল, রফিক ভাই, তেমার চোখে পানি দেখে আমি গর্বিত ও কৃতার্থ। আমার অনুমান, আমার স্বপ্ন মিথ্যা হয়নি। তোমাকে আপন করে পাব কিনা জানি না। তবে আল্লাহপাকের কাছে আজীবন দোয়া করে যাব, "তিনি যেন আমার রফিককে কামিয়াব করেন। তাকে সর্বদা সৎপথে চালিত করেন। তারপর তার গলা ধরে এল দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁফিয়ে উঠল।

রফিক এতক্ষণ যেন বাস্তবে ছিল না। সেও রোকেয়াকে ছেলেবেলা থেকে ভালবেসে আসছে। বড় হয়ে যখন সে সবকিছু বুঝতে পারল। তখন থেকে নিজেকে কঠোরভাবে সংযত করে রেখেছে। কখনও রোকেয়ার কাছে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করে নি। কারণ হিসাবে মন করত, সে একজন দরিদ্র কৃষকের এতিম ছেলে। রোকেয়াকে নিয়ে কোনো কিছু চিন্তা করা তার পক্ষে মহা অন্যায়। তাছাড়া সোলেমান সাহেব খুব বিশ্বাস করে একমাত্র মেয়েকে তার কাছে পড়তে দিয়েছেন। বিশ্বাসের মর্যাদা সে জীবন দিয়ে হলেও রাখবে। তব কি করে যে রোকেয়া তার মনের খবর পেল, বুঝতে পারল না, রোকেয়ার কথা শুনে তার মনে পড়ল, অনেক আগের কথা, যে কথা মনে পড়লে আজও তার অনুশোচনা হয়। জীবনে ঐ একবার মাত্র অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলেছিল, তাকে পড়িয়ে টাকা নিতে মন চয় না। আজ রোকেয়ার এইসব কথা শুনে প্রথমে নিজেকে সামলাতে না পেরে তার চোখে পানি এসে গেছে। আর তাই দেখে রোকেয়া এত বেপওয়া হয়ে তার মনের কথা অকপটে প্রকাশ করল!

সামলে নিয়ে রফিক বলল, তোমাকে আজ আমার কিছু বলার নেই। তবে জেনে রেখ, তোমার চেয়ে আমিও কম গর্বিত নই। আমার মতো গরিব কৃষকের ছেলে বেহেস্তের হুর সাদৃশ্য সর্বগুণে গুণান্বিতা। ধনী কন্যার মনে জায়গা পেয়েছি। তবে কি জান? সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। আমরা দু'জন দু'জনরেক ভীষণ ভালবাসি। সেই ভালবাসার দাবিতে আল্লাহপাকের কসম দিয়ে বলছি, আমাদের মিলনে যদি কোনো বাধা আসে, তবে আমরা কেউ যেন আত্মঘাতী না হই। আল্লাহ যদি আমাদেরকে জোড় করে পয়দা করে থাকেন, তাহলে মিলনে যত বাধা আসুক না কেন, তা তিনি দূর করে দেবেন। আমাদের মনের কথা তিনি জানেন। তুমি আমাকে কখন ভুল বুঝো না। আমার ভালবাসার বিশ্বাস হারিয়ো না। নামাযের পরে দোয়া করো, আল্লাহ যেন আমাকে তোমার উপযুক্ত করে যথা সময়ে ফিরিয়ে আনেন।

রোকেয়া কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলল, তুমি যেভাবে দোয়া করতে বললে, সেইভাবেই করবো। আর তুমিও আমার জন্য দোয়া করো, সেই পরম

করুণাময় যেন আমাকে তোমার পদসেবা করার জন্য মনোনীত করেন। কথা শেষ করে রোকেয়া আর দাঁড়ায়নি। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেছে।

তারপরের ঘটনা মনে পড়তে রফিক চমকে উঠল। রফিক তখন ইংলিশে আনার্স পড়ছে। এতদিন তাদের দু'জনের মধ্যে চিঠির মাধ্যমে খবরা খবর দেওয়া নেওয়া হচ্ছিল। মাঝে মাঝে রফিক ছুটিতে দেশে গিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। রফিক তার মাকে চিঠি দেওয়ার সময় তার সঙ্গে আলাদা কাগজে রোকেয়াকেও দিত। রোকেয়া রফিকের মায়ের চিঠির সঙ্গে নিজের চিঠি পোষ্ট করত।

হঠাৎ করে চিঠি বন্ধ হয়ে যেতে রফিকের মন খুব খারাপ হয়ে যায়। সে বার বার চিঠি দিয়েও কোনো উত্তর পেল না। অস্থির হয়ে সে যেদিন বাড়ি যাবার মনস্থ করল, তার আগের দিন মায়ের চিঠি পেল। তাড়াতাড়ি খুলে পড়ে তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

মা লিখেছে, গ্রামে কলেরা হয়ে অনেক লোক মারা গেছে। সেই সঙ্গে সোলেমান সাহেবের একমাত্র মেয়ে রোকেয়াও মারা গেছে।

চিঠি পড়ে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' বলে রফিক কতক্ষণ কেঁদে ছিল খেয়াল নেই। কারুর ডাকে যখন তার খেয়াল হল তখন দেখল, তার একটা ছাত্র তাকে বলছে স্যার, আপনি কাঁদছেন কেন?

রফিক চোখ মুছে বলল, আমার এক আত্মীয় মারা গেছে। এরপর থেকে সে আর দেশে যায়নি। যখনই মাকে দেখতে যাবে বলে ইচ্ছা করে তখনই রোকেয়ার কথা তার মনে পড়ে যায়। সেখানে গিয়ে রোকেয়াকে দেখতে পাবে না, এ কথা মনে হলে আর যেতে ইচ্ছা করে না।

প্রায় আড়াই বছর পর মায়ের অসুখের খবর পেয়ে সেই যে একবার গিয়ে মাকে নিয়ে এসেছে, আজ তিন চার বছর হতে চলল সে আর দেশে যায় নি।

কুলসুম বিবি ছেলেকে কতবার বলেন, আমাকে নিয়ে ক'দিনের জন্য দেশের বাড়িতে চল না। আত্মীয়-স্বজনকে দেখার জন্য মন কেমন করছে।

রফিক মাকে নানান অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যায়। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে তার চোখ দুটো অশ্রুতে ভরে উঠল। সে রোকেয়ার রুহের মাগফেরাতের জন্য মনে মনে আল্লাহপাকের কাছে দো'য়া করল। হাতে মেম সাহেবের দেওয়া কার্ডটার দিকে লক্ষ পড়তে তার মনে হল, মৃত রোকেয়া যেন জীবন্ত মেম সাহেব।

পরের দিন রফিক আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে কার্ডে লেখা ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছল।

দারোয়ান সালাম ঠুকে জিজ্ঞেস করল, কাকে চান?

রফিক কার্ড বের দেখিয়ে বলল, এটার মালিক এই সময় আমাকে আসতে বলেছেন।

কার্ডটা দেখেই দারোয়ান আর একবার সালাম ঠুকে বলল, সোজা ভিতরে চলে যান।

রফিক গেটের ভিতর ঢুকে লন পেরিয়ে গাড়ি বারান্দায় সেই গাড়িটা দেখতে পেল। মাঝারী ধরণের দোতলা বাড়ি। বাড়িটার চারপাশে দেশী-বিদেশী নানা রকম ফুলের গাছ। সে তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে একটা গোলাপ ফুলের গাছের কাছে গিয়ে একটা ফুল তুলতে গেল।

এমন সময় কোথা থেকে একজন মালি ছুটে এসে বাধা দিয়ে বলল, করেন কি? ফুল তুলবেন না। মেম সাহেব দেখলে আপনাকে আস্ত রাখবেন না।

রফিক তার কথায় কর্ণপাত না করে ফুলটা তুলে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকল।

দিলেন তো সর্বনাশ করে। মেম সাহেব জানতে পারলে আমাকে ভীষণ রাগারাগী করবেন, আর আমার চাকরিটাও যাবে।

রফিক বলল, আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি মেম সাহেবকে বলে দেব। জিজ্ঞেস করল, কতদিন এখানে কাজ করছেন?

একজন ভদ্রলোক তাকে আপনি করে কথা বলছে দেখে মালি অবাক হয়ে কয়েক সেকেণ্ড তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তা পাঁচ ছ'বছর হবে।

আপনার দেশ কোথায়? এখানে চাকরি পেলেন কি করে ?

দেশ বরিশাল। এখনকার সাহেব আমাদের দেশের। তিনিই দিয়েছেন।

গতকালের মেম সাহেবের গাড়ির ড্রাইভারকে আসতে দেখে রফিক তার দিকে তাকাল। লোকটা ঈশারা করে রফিককে তার সঙ্গে আসতে বলে এগোল। রফিক তাকে অনুসরণ করল। ড্রইংরুমে এসে বসতে ঈশারা করে সে ভিতরে চলে গেল।

রফিক একটা সোফায় বসে ঘড়ি দেখল, আটটা বেজে এক মিনিট।

মেম সাহেব দরজার পরর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে গুড মর্নিং বলে মৃদু হেসে বলল, এক মিনিট লেট করে ফেললাম।

রফিক কিছু না বলে তার দিকে চাইল।

মেম সাহেব আজ ঘীয়ে রং এর সালওয়ার কামিজ পরেছে। রফিকের মনে হল, একটা বেহেশতের হুর তার সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক সেকেণ্ড সে পলকহীনভাবে চেয়ে রইল। তারপর সামলে নিয়ে দৃষ্টিটা নিচের দিকে করে বলল, আমি আমার কথা রেখেছি।

মেম সাহেব সোফায় বসে বলল, তাতো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আপনার নামটা এখনও জানতে পারলাম না।

রফিক।

বাঃ বেশ সুন্দর নাম তো। আমার নাম লিজা। আচ্ছা আপনি কি ধরণের চাকরি চান?

যে কোনো কাজ আমি করতে পারব।

আমার কাছে কাজ করবেন? ভালো বেতন পাবেন, থাকা-খাওয়া, জামা-কাপড় সব ফ্রী।

রফিক গম্ভীর হয়ে বলল, আমাকে কি করতে হবে?

ড্রাইভ করবেন। সব সময় আমার সঙ্গে থাকবেন। কোনো বিপদ এলে আমাকে রক্ষা করবেন। রবার্ট, আই মীন, ঐ যে লোকটা আপনাকে এনে বসাল, সে অবশ্য এতদিন এই কাজ করে আসছে। কিন্তু তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ অসুবিধেয় পড়তে হয়। কারণ লোকটা কালা ও বোবা। কিন্তু দারুণ বিশ্বস্ত আর ভীষণ শক্তিশালী। তাইতো এখানে আসার সময় নানি তাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

রফিক বলল, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে জানাচ্ছি, এই কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তারপর গোলাফ ফুলটা একবার শুঁকে নিয়ে টেবিলের উপর ফুলদানিতে রেখে আবার বলল, এই ফুলটা নিচের বাগান থেকে আসার পথে মালির নিষেধ সত্বেও তুলেছি। দয়া করে তাকে কিছু বলবেন না। এবার আসি, ধন্যবাদ।

রফিক চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

লিজা বলল, আরে চলে যাচ্ছেন কেন? বসুন। এই কাজ পছন্দ না হলে অন্য কাজ করবেন। লণ্ডনে আমাদের গাড়ির ব্যবসা আছে। আপনি রাজি থাকলে সেখানে একটা ভালো জব দিতে পারব।

রফিক কয়েক মুহূর্ত লিজার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, কৌতুক করছেন? না বাসায় ডেকে এনে অপমান করছেন? আমার চাকরির দরকার নেই। ধন্যবাদ। তারপর লিজা কিছু বলার আগে হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লিজা কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে রফিকের চলে যাওয়া দেখল।

বন্ধু আবিদের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যে তাদের লাইব্রেরীর পাশে একটা বড় ষ্টেশনারী দোকানে রফিক চাকরি পেল ম্যানেজার কাম ক্যাশিয়ার হিসাবে। তাকে ক্যাশ ড্রিল করতে হয় বলে প্রায় দোকানেই নামায পড়ে। দোকানে আরও চার পাঁচজন কর্মচারী আছে। তারা সবাই ওর থেকে জুনিয়ার। কাজটা মোটামুটি ভালই, তবে ডিউটি বড় বেশি। সকাল নটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত। পড়াশোনা করতে পারছে না বলে অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছে। তা সত্বেও অন্য কিছু জোগাড় করতে না পেরে প্রায় এক বছর এখানে কাজ করছে।

একদিন রফিক মাগরিবের নামায দোকানে পড়ছে, এমন সময় লিজা দোকানে এসে একজন কর্মচারীর কাছে একটা পারকার পেন চাইল।

রফিক নামায শেষ করে ক্যাশে বসতে লিজা এগিয়ে এসে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন?

রফিক লিজাকে চিনতে পেরে 'হাদাকাল্লাহ' বলে বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি মুসলমান?

লিজা হাসিমুখে বলেল, না, তবে মুসলমানদের রীতিনীতি কিছুটা জানি। আপনি সেদিন রাগ করে চলে এলেন কেন? এখানে কতদিন কাজ করছেন?

রফিক বলল, প্রায় এক বছর হয়ে গেল, সেদিনের কথা বাদ দিন।

লিজা কলমের দাম দিয়ে যাওয়ার সময় একটা কার্ড দিয়ে বলল, আমি এখন এই ঠিকানায় থাকি। একদিন সময় করে আসবেন? এলে খুব খুশি হব। আচ্ছা, আসি ধন্যবাদ, কথাটা মনে রাখবেন বলে লিজা চলে গেল।

লিজার কথাগুলো রফিকের কানে করুণ শোনাল। এই ঘটনার কিছুদিন পর রফিক একদিন সাইন্স ল্যাবরেটারীর মোড়ের মসজিদে মাগরিবের নামায পড়ার জন্য ঢুকল। নামাযের শেষে মসজিদের ভিতর অনেক লোকের জটলা দেখে এগিয়ে গেল। দেখল, লিজা দেওয়ালে হেলান দিয়ে জামা গেড়ে বসে আছে, আর ছেলে বুড়ো সব রকমের মুসুল্লিরা হৈ চৈ করছে। তাদের মধ্যে দু'একজন সুট পরিহিত ভদ্রলোক ইংরেজীতে তাকে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে বলছেন। কিন্তু লিজা ষ্ট্যাচুর মতো নির্নিমেষ নয়নে বসে আছে।

রফিক মুসুল্লিদের বলল, আপনারা চুপ করুন। মনে রাখবেন, এটা আল্লাহর ঘর, এখানে সকলের আসার অধিকার আছে।

রফিকের দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে সকলে চুপ করে গেল।

রফিক লিজার কাছে গিয়ে বলল, আসুন আমার সঙ্গে। যারা এতক্ষণ তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল, তারা সবাই অবাক হয়ে দেখল, রফিকের বাংলা কথাতেই মেম সাহেব উঠে তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

রফিক জিজ্ঞেস করল গাড়ি আছে?

লিজা কথা না বলে দাঁড়িয়ে পড়ে আঙ্গুল তুলে পার্ক করা গাড়ি দেখাল।

রফিক বলল, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।

মেম সাহেব মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মেম সাহেবের যাবার ইচ্ছা নেই বুঝতে পেরে রফিক তার একটা হাত ধরে বলল, আসুন। মেমসাহেবকে রফিকের এ্যাবনরমাল মনে হল। তাকে সামনে বসিয়ে নিজে ড্রাইভিং সিটে বসে ষ্টার্ট দিল।

এবার লিজা কথা বলে উঠল..... নং গ্রীণ রোড।

রফিক বেশ অবাক হলেও কোনো কথা জিজ্ঞেস না করে ঠিকানামতো এসে গাড়ি পার্ক করল।

লিজা আগে নামল। রফিক নামতেই বলল,আসুন, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

রফিক বলল, কিন্তু.....

কোনো কিন্তু নয়, প্লীজ বলে এমন করুণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল যা দেখে রফিক না করতে পারল না। তারা দোতালার একটা ফ্লাটের ড্রইংরুমে এসে বসল।

রফিক জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে একা থাকেন?

লিজা এতক্ষণ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছিল, আর পারল না। উঠে এসে রফিকের পায়ের কাছে বসে তার দুটো হাত ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। আর তার হাঁটুর উপর মুখ ঘসতে ঘসতে বলল, প্লীজ সেভ মি, প্লীজ হেল্প মি।

রফিক লিজার কাণ্ড দেখে বরফের মত জমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পর যখন তার কান্না থামল তখন বলল, ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে সাহায্য করব, এখন উঠে বসুন।

রফিকের কথা শুনে মেমসাহেব উঠে একরকম ছুটে ভিতরে রুমে চলে গেল। প্রায় মিনিট দশেক পর দুহাতে দুকাপ কফি নিয়ে এসে একটা রফিকের হাতে দিয়ে সামনের সোফায় বসল।

কফি খাওয়া শেষ করে লিজা বলল, মসজিদে আপনার সঙ্গে দেখা না হলে আজ সুসাইড করে ফেলতাম।

রফিক খুব অবাক হয়ে বলল, সুসাইড করবেন কেন? জানেন না, এটা মহাপাপ? আচ্ছা, আপনি মসজিদে গিয়েছিলেন কেন?

মনে হয়েছিল ওখানে গেলে শান্তি পাব।

এবার বলুন, আপনি কিভাবে আমার কাছ থেকে সাহায্য পেতে চান।

লিজা কিছুক্ষণ রফিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তার আগে আমার সম্বন্ধে আপনার সবকিছু জানা দরকার। তারপর বিবেচনা করে দেখবেন, কিভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

বেশ বলুন।

লিজা বলতে আরম্ভ করল-

আমি যখন লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন একজন বাঙালী মুসলমান ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি তার চেয়ে এক বছরের জুনিয়ার ছিলাম। দু'জনের সাবজেক্ট এক ছিল। তার নাম সফিকুল ইসলাম। আমি তাকে সফিক বলে ডাকতাম। ছেলেটি খুব ইন্টেলিজেন্ট, পড়াশোনাতেও খুব ভালো। আমি তার কাছে নোট নিতাম। অবসর সময়ে তার সঙ্গে ডেটিং এ গেছি। ক্রমশঃ আমরা দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। অর্থাৎ প্রেমে পড়ে গেলাম।

আমার যখন বার বছর তখন আমার বাবা অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলস্বরূপ লিভার নষ্ট হয়ে মারা যান। বাবা মারা যাওয়ার পর মা আমাকে নিয়ে নানার কাছে চলে আসে। মা নানার একমাত্র সন্তান। নানা বিরাট ধনী। মটর গাড়ির বিজনেস। মা নানার অফিসে নানাকে সাহায্য করত। সেই সময় অফিসের একজন বড় অফিসারের সঙ্গে মায়ের মন দেওয়া-নেওয়া হয়। সে ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের লোক। সুযোগমত মা নানার বহু টাকা পয়সা নিয়ে সেই অফিসারের সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডে চলে যায়।

আমি প্রথমে এসবের কিছু জানতে পারিনি। কারণ আমি তখন স্কুলে পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। মা তার অফিস নিয়ে থাকত। বলতে কি নানার বাড়িতে মায়ের চেয়ে নানা নানির সঙ্গে আমার যোগাযোগ বেশি ছিল।

মা চলে যাওয়ার পর তাকে দেখতে না পেয়ে একদিন জিজ্ঞেস করে উক্ত ঘটনা জানতে পারি। শুনে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নানা-নানি আমাকে অনেক বোঝাতেন।

প্রায় বছর দুই পরে মা আমাকে চিঠি দেয়, আমি যেন ভালভাবে লেখাপড়া করি, আর নানা-নানির কথামত চলি। তারপর মায়ের আর কোনো খোঁজ পাইনি। মায়ের দেওয়া পত্রের ঠিকানায় অনেকবার চিঠি দিয়েও উত্তর না পেয়ে চিঠি দেওয়া বন্ধ করে দিই। যাক সে সব অনেক দিন আগের কথা।

তারপর ইউনিভার্সিটিতে সফিকের সঙ্গে মেলামেশার পর একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি পাশ করে কি দেশে ফিরে যাবে? যদি এখান থাক, তাহলে নানাকে বলে আমি তার অফিরেস ম্যানেজার করে দিতে পারব বলে আশা রাখি। তবে পাশ করার পর আগে আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব।

সফিক বলল, ঠিক আছে, আগে পাশ করে নিই, তারপর যা করার করা যাবে।

কয়েক মাস পরের ঘটনা। ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। একদিন পার্কে বেড়াতে গিয়ে রাত হয়ে যায়। দু'জনে বসে গল্প করতে করতে আমি তার দেশের সব কথা জেনে নিই। সেদিন ও অনেক মিথ্যা কথা বলেছিল। তখন কিন্তু তার সব কথা সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলাম। যাই হোক, রাত বেশি হয়ে গেছে দেখে বললাম, এবার ফেরা যাক।

সফিক তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে কিস দিতে দিতে শুইয়ে দিয়ে আমার প্যান্টের বোতাম খুলতে উদ্যত হল।

আমাদের মেলামেশা ও প্রেমের ব্যাপারটা নানা-নানি জানতেন। কারণ আমি তাদের কাছে সফিকের পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার মতামত জানিয়েছিলাম। নানা প্রথম দিকে মত দেননি। শেষে সফিক যখন আমাদের বাড়িতে প্রায় আসতে লাগল এবং তার ভালো ব্যবহার দেখে অথবা আমার মায়ের কথা চিন্তা করে নানিকে দিয়ে জানালেন, লিজাকে বলে দিও, সে যেন তার মায়ের মতো কোনো অঘটন ঘটিয়ে না ফেলে। আগে ওরা পাশ করুক, তারপর বিয়ে দিয়ে যা করার আমি ব্যবস্থা করব।

আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করি তখন নানি আমাকে বলেছিল, জীবন গেলেও কোনো পুরুষকে বিয়ের আগে দেহ দান করবি না। যদি করিস, তবে তোর দাম তার কাছে কমে যাবে। তোদের প্রেমও বেশি দিন টিকবে না। কারণ পুরুষটি তখন মনে করবে, তুই এর আগে নিশ্চয় অন্যকেও দেহ দান করেছিস।

তাই সফিক যখন আমার প্যান্টের বোতাম খুলতে গেল, তখন আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, প্লীজ সফিক, এখন এ কাজ করো না। এই রত্ন তোমার, তোমারই থাকবে। এর আগে কোনো ছেলেকেই প্রশ্রয় দিইনি। তুমি আমার জীবনে প্রথম পুরুষ। আমার সব কিছু তোমার। তবে এখন কিছুতেই তোমাকে এসব দিতে পারব না। আগে বিয়ে হয়ে যাক, তারপর আর বাধা দেব না। প্লীজ, আমাকে অপমান করো না। তোমার কাছে অপমাণিত হলে তোমার সম্বন্ধে আমার যে অহংকার তা চূর্ণ হয়ে যাবে। আমার বান্ধবীদের কাছে তোমার সংযমের কথা বলে এতদিন কত গর্ব বোধ করে এসেছি।

আমার কথা শুনে সফিক খুব রেগে গেল। কোনো কথা না বলে আমাকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত পার্ক থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

আমি উঠে পড়ে তাকে ডাকতে ডাকতে ছুটলাম। কিন্তু পেলাম না। শেষে একা বাড়ি ফিরে এলাম।

পরের দিন তার সঙ্গে দেখা করে গতকাল আমাকে পার্কে একা ফেলে চলে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। সে যেন আমার কথা শুনতে পায়নি এমন ভাব দেখাল। তারপর অনেকবার ক্ষমা চেয়ে কাকুতি মিনতি করার পর বলল, তোমাদের দেশের কোনো মেয়ের

সতীত্ব নেই। ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলে গার্জেনদের কাছ থেকে ফ্রী হয়ে যায়। তখন তারা নিজেদের ইচ্ছামত চলাফেরা করে। তুমি যদি আজ পর্যন্ত কুমারী থেকে থাক, তবে দু একদিনের মধ্যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। রাজি আছ কি না বল। যদি রাজি না থাক, তবে তোমার সঙ্গে এই শেষ। আর কোনো দিন তুমি আমার কাছে আসবে না।

আমি তখন তার প্রেমে পাগল। তাছাড়া সে আমার চরিত্রের উপর সন্দেহ করছে ভেবে তার চাতুরী ধরতে পারলাম না।

বললাম, তুমি আমার প্রেমকে অবিশ্বাস করছ? ঠিক আছে আমি রাজি। তবে একথা নানা-নানিকে জানান চলবে না। তোমার রেজাল্ড আউট হওয়ার পর জানাব।

সফিক মনে মনে এটাই চাচ্ছিল। বলল, বেশ তাই হবে।

এর দুদিন পর আমরা কোর্টশীপ করে বিয়ে করলাম। কয়েক মাস পর রেজাল্ট বের হল। ভালোভাবেই সফিক পাশ করল। এবার আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা নানা-নানিকে জানাব কিনা আলোচনা করার জন্য একদিন সফিকের রুমে গেলাম। রুম খোলা অথচ সফিক নেই। বুঝতে পারলাম বাথরুমে ঢুকেছে। টেবিলের কাছে চেয়ারে বসতে গিয়ে একটা বাংলাদেশের এনভেলাপ দেখতে পেলাম। কৌতুহল বশতঃ এনভেলাপটা হাতে নিয়ে দেখলাম সটা খোলা। তখন চিঠিটা পড়ার আগ্রহ দমন করতে না পেরে বের করে পড়তে লাগলাম।

চিঠিটা পড়তে পড়তে মনে হল, আমার মাথায় বিনামেঘে বজ্রপাত হল। আমার শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। চিঠিতে লেখা আছে-

বাবা সফিক, তুমি পরীক্ষার ফলাফল বেরোবার পর তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। ফিরে এলেই শিরীনের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। তুমি তো জান, ঐ আমার একমাত্র নয়নের মনি। তুমি তাকে অনেকদিন চিঠি দাওনি কেন? এদিকে মা মনি আমার শুকিয়ে যাচ্ছে। আর শোন, শিরীন ফার্ষ্ট ডিভিশনে বি, এ, পাশ করেছে। আশা করি, তুমি তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করবে। তারপর ঘরের সব অন্যান্য খবর।

আমি কী করব? এখন আমার কি করা উচিত এইসব উদভ্রান্তের মত ভাবতে লাগলাম।

সফিক বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমার অবস্থা দেখে এগিয়ে এসে বলল, কি ব্যাপার লিজা? তোমাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন? তোমার কী শরীর খারাপ?

আমি দাঁড়িয়ে চিঠিটা তার হাতে দিয়ে বললাম, সফিক এসব কি ব্যাপার? তুমি এতবড় মিথ্যাবাদী, এতবড় পাষণ্ড, এত নীচ, আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে একি সর্বনাশা খেলা খেললে? তোমাকে যে আমি কী বলব তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। যাকে আমি জীবনের সব থেকে বেশি বিশ্বাস করে ভালবাসলাম, সে একজন মিথ্যাবদী, প্রবঞ্চক, একথা মনে করে আমি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি। তুমি না, হ্যাঁ তুমি একটা জঘন্য নরকের কীট। আমি তোমাকে তার থেকেও বেশি ঘৃণা করি। তারপর আর আমার গলা থেকে কথা ফুটল না। আমি জ্ঞান হারালাম।

যখন জ্ঞান ফিরল দেখলাম, আমি সফিকের বেডে শুয়ে রয়েছি। মনটা ঘৃণায় কুঁচকে উঠল। বেড থেকে নেমে সফিককে দেখতে পেলাম না। তাড়াতাড়ি করে তখন আমি নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসি। সারাদিন আর ঘর থেকে বের হইনি। রাত্রে নানি খাওয়ার জন্য ডাকতে এলে বললাম, আমার শরীর খারাপ, কিছু খাব না।

নানি আমার মুখের দিকে চেয়ে আঁৎকে উঠে বললেন, একি চেহারা তোর? কি হয়েছে বলতো? সারাটাদিন ঘর থেকে বের হলি নি? এত মন মরা কেন? মনে হচ্ছে সারাদিন কেঁদেছিস। তোর চোখমুখ ফুলে গেছে। সত্যি করে বলতো কি ব্যাপার? সফিকের সঙ্গে কোনো গোলমাল হয়েছে?

আমার তখন কান্না পাচ্ছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সামলে নিয়ে বললাম, আমার কিছু হয়নি, তুমি যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

নানি কিন্তু গেলেন না। আমার কাছে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভিজে গলায় বললেন, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। আমাকে তুই খুলে বল। কোনো দ্বিধা বা ভয় করিস না। তোর কিছু হলে আমরা কাকে নিয়ে বাঁচব।

নানির চোখে পানি দেখে সফিকের সঙ্গে বিয়ের কথাও আজকের চিঠির কথা বলে তার কোলে মুক গুঁজে কাঁদতে লাগলাম।

নানি আমার মাথা দুহাতে তুলে ধরে গর্জন করে উঠলেন, কি বললি?

বাঙালী ছেলেটার এতবড় সাহস? দাঁড়া তোর নানাকে বলে বাছাধনকে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব।

নানির রাগ দেখে ও তার কথা শুনে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। কারণ নানার কানে কথাটা উঠলে তিনি সফিককে জেলে না পাঠিয়ে ছাড়বেন না। এমন কি গুণ্ডা দিয়ে তাকে খুন করে ফেলতেও পারেন। যাকে প্রাণ অপেক্ষা বেশি ভালবাসলাম, তার পরিনামের কথা চিন্তা করে বললাম, না, তুমি নানাকে এইসব ব্যাপারে কিছু বলো না। যাকে ভালবেসে স্বামী বলে গ্রহণ করেছি, তাকে শাস্তি দিলে আমার ভালবাসাকে অপমান করা হবে। হোক না সে মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক। আমি আমার প্রেমকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারব না। তুমি এখন যাও, আমাকে একা ভাবতে দাও। নানি আর কিছু না বলে চলে গেলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে আমি সামলে উঠলাম। সামনে পরীক্ষা পড়াশোনায় মন বসাতে পারলাম না। ভার্সিটি বন্ধ। কোনো বন্ধু-বান্ধবীর বাড়িতেও যেতে ইচ্ছা করত না। একা একা গাড়ি নিয়ে পার্ক থেকে বেড়িয়ে আসতাম।

একদিন পার্কের গেট দিয়ে ঢুকে দেখি, সফিক দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলল, তুমি সেদিন আমার কোনো কথা না শুনেই চলে এলে। আমি ডাক্তার নিয়ে এসে দেখি, তুমি নেই। চল বসা যাক। আমার কিছু কথা তোমাকে শুনতেই হবে। তাকে দেখতে পেয়ে প্রথমে আমার মনে আনন্দের জোয়ার এসেছিল। মনে হয়েছিল, যেন কত বছর সফিককে দেখিনি। তারপর তার কথা শুনে মনে হল, শত শত ভ্রমর আমার কলিজায় হুল ফোটাচ্ছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তবু গেলাম। ভাবলাম দেখি, নিজের দোষ ঢাকবার জন্য আর কত মিথ্যা বলতে পারে। যন্ত্রচালিতের মতো আমি তার সঙ্গে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসলাম।

সফিক আমার হাত ধরে বলল, তোমাকে দু'একটা মিথ্যা কথা কেন বলেছি জান? তখন আমি সত্যিই তোমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছিলাম। মনে করেছিলাম, সত্য কথা বললে তোমাকে পাব না। এর জন্য আমি তোমার কাছে অপরাধী। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কিছুদিনের মধ্যে আমি দেশে ফিরে যাব। তুমি যখন সব জেনে গেছ তখন আর কোনো কথা গোপন করব না। আমার বাবার অবস্থা এমন নয় যে, আমাকে বিদেশে পড়াতে পাঠাবে। আমার উচ্চ শিক্ষা নেওয়ার কথা শুনে আমার চাচা তার একমাত্র মেয়ে শিরীনের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক করে এখানে পড়াতে পাঠান। চাচাদের অবস্থা খুব ভালো। চাচাতো বোন শিরীন দেখতে তেমন ভালো না হলেও উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য এক রকম বাধ্য হয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলাম। এখানে এসে তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর ভেবেছিলাম, আমার পিছনে চাচার যত টাকা খরচ হয়েছে, তা ফেরৎ দিয়ে দেব। তাই বলছিলাম, টাকাটা যদি তুমি দাও, তাহলে আমি চাচাকে তার টাকা ফেরৎ দিয়ে বলব, আমি তোমাকে বিয়ে করেছি। মেয়ের বিয়ে যেন তিনি অন্য জায়গায় দিয়ে দেন। তাহলে মনে হয় কোনো গোলমাল হবে না। সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমি আমার

চাচাতো বোনকে মোটেই পছন্দ করি না। তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলে শুধু কর্তব্যের খাতিরে হয় তো তাকে বিয়ে করতাম। বিশ্বাস কর লিজা, আমি তোমাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালবাসি এবং আজীবন বেসে যাব। আমি তোমাকে না পেলে পাগল হয়ে যাব। আমাকে তুমি যা খুশি ভাবতে পার। কিন্তু আমাদের প্রেমকে তুমি কী অস্বীকার করতে পারবে? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, প্লীজ লিজা কিছু বল, চুপ করে থেক না। আমার তরফ থেকে আর যদি জীবনে কোনো রকম ছল-চাতুরী পাও, তা হলে তুমি যা শাস্তি দিবে মাথা পেতে নেব।

সফিক যত অন্যায় করুক, আমি যে তাকে প্রাণ অপেক্ষা বেশি ভালবাসতাম। তাই আবার তার ফাঁদে পা দিয়ে তার সকল কথা বিশ্বাস করলাম। বললাম, নানাকে তো এসব কতা বলা যাবে না। তবে নানিকে বলে রাজি করিয়ে তার কাছ থেকে এবং আমার কাছে যা আছে তা দিয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করব।

সফিক খুশি হয়ে আমার দুটো হাত ধরে ছেলে মানুষের মত কেঁদে ফেলল। বলল, সত্যি লিজা তোমার কোনো তুলনা হয় না।

তার কান্না দেখে আমারও তখন চোখে পানি এসে গেল। ভাবলাম, সফিক ধনীলোকের ছেলে না হলেও কিছু আসে যায় না। নানা তো সবকিছু আমার নামে উইল করে রেখেছেন। দুজন মিলে নানার বীজনেস দেখাশোনা করে সুখে দিন কাটাতে পারব। নানিকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার কাছ থেকে যা আদায় করলাম, আর আমার কাছে যা ছিল সব মিলিয়ে একহাজার পাউণ্ড তাকে দিলাম। আমি তার সঙ্গে আসতে চাইতে বলল, তোমার ফাইনাল পরীক্ষা বাকি আছে। তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা কর। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। কাঁদতে কাঁদতে তাকে প্লেনে তুলে দিলাম। কথা হল, পৌঁছেই সে আগে টেলিফোন করবে, পরে পত্র দেবে।

কিসের কি? সপ্তাহ, মাস, গড়িয়ে গেল। না আসল টেলিফোন, না আসল পত্র। তখন অধৈর্য্য হয়ে আমি তাকে পত্র দিলাম। তারও উত্তর পেলাম না। আমার মন ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগল। পড়াশোনায় এতটুকু মন বসাতে পারলাম না। পরপর কয়েকটা পত্র দিয়েও নিরাশ হলাম।

মাস তিনেক পর নানা হঠাৎ এ্যাকসিডেন্ট করে মারা গেলেন। আমার তো তখন উম্মাদের মত অবস্থা। নানি কিন্তু বিচলিত হন নি। তিনি সংসারের ও বীজনেসের হাল শক্ত হাতে ধরলেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে সব কিছু চালাতে লাগলেন। আমার পরীক্ষা দেওয়া হল না। মাস ছয়েকের মধ্যে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। অফিসের বড় বড় অফিসাররা এবং অন্যান্য জানাশোনা লোক আমাকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠল।

নানি তাদেরকে বললেন, লিজার বিয়ে হয়ে গেছে। ওর স্বামী বিশেষ কাজে বাংলাদেশে গেছে। এরপর তাদের ঝামেলা কমল। কিন্তু আমি নিজে আর স্থির থাকতে পারলাম না। নানিকে বললাম, আমি বাংলাদেশে সফিকের কাছে যাব।

নানি বললেন, তুই একা মেয়েছেলে অতদূরে যাবি কি করে? সেখানে তোর বিপদ হতে পারে? তাছাড়া সফিক আট নয় মাস হয়ে গেল কোনো চিঠি পত্র দিল না। তার দেওয়া ঠিকানায় যদি তাকে না পাওয়া যায়, তখন কি করবি? কোন সাহসে তুই সেখানে যেতে চাস?

বললাম, তা হলে কি সারা জীবন এভাবে কাটাব? আমাকে দ্বিতীয় বার ফাঁদে ফেলেছে কিনা জানার জন্য আমার মন খুব উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। তারপর দৃঢ়স্বরে বললাম, আমি বাংলাদেশে যাবই।

নানি আমার সংকল্প শুনে বললেন, বেশ যেতে চাচ্ছ যাও। তবে আমার মনে হয়, সফিক তোর সঙ্গে বেঈমানি করেছে। যদি সত্যি সত্যিই সফিক তার চাচাতো বোনকে বিয়ে করে থাকে, তা হলে কোর্ট থেকে ডিভোর্স নিয়ে কাগজ পত্রসহ শীঘ্রি ফিরে আসবি।

রবার্টকে নিয়ে আমি বাংলাদেশে এলাম। প্রথমে একটা হোটেলে উঠে সফিকের খোঁজে তার দেওয়া ঠিকানায় গেলাম। সেখানে গিয়ে যা শুনলাম, তাতে আমি দু'চোখে অন্ধকার দেখলাম। যেটুকু আসার আলো বুকে করে এসেছিলাম, তা একদম নিভে গেল। দ্বিতীয় বারও যে প্রতারণা করবে, তা আমি কল্পনাও করি নি। ও যে কত বড় কালপ্রিট, তা তাদের বাড়িতে গিয়ে বুঝতে পারলাম। রাগে ও ঘৃণায় আমার শরীর রী রী করতে লাগল।

সফিক বাড়িতে ছিল না। তার শ্বশুর অর্থাৎ চাচা ছিলেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চান?

বললাম, এটা কি সফিকদের বাড়ি? উনি কি আছেন?

ভদ্রলোক খুব বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন-হ্যাঁ, এটা তাদের বাড়ি। সে এখানে নেই। চারমাস হল তার স্ত্রীকে সাথে করে জাপানে চাকরি নিয়ে চলে গেছে।

কথাগুলো শুনে আমার জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হল। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে কোনো রকমে সেখান থেকে চলে আসি। কি করব ভেবে ভেবে মাস খানেক কেটে গেল। এর মধ্যে নানিকে সফিকের সব ব্যাপার জানিয়ে পত্র দিলাম। নানি আমাকে ফিরে যেতে বললেন। আমিও তাই ঠিক করলাম।

হঠাৎ একদিন নিউমার্কেটে সফিকের বন্ধু আকমলের সঙ্গে দেখা। আকমল ও সফিক একই সময়ে লণ্ডনে পড়তে গিয়েছিল। তার সাবজেক্ট আলাদা ছিল। ইউনিভার্সিটিতে সফিক একদিন আকমলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। পরিচয় হওয়ার কয়েকদিন পর সে আমার সঙ্গে ডেটিং এ যেতে চাইল।

আমি বললাম আপনার বন্ধু সফিকের সঙ্গে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কখন ডেটিং এ যাইনি।

সে এই কথা সফিককে জিজ্ঞেস করে। সফিক তাকে স্পষ্ট জানিয়েছিল, তুমি লিজার সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করো না। কারণ সে এদেশের মেয়ে হয়েও অনন্যা। আর সে আমার প্রেয়সী। আমরা দু'জনে ঘর বাঁধার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তারপর থেকে আকমল আর আমার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশবার চেষ্টা করেনি। তবে দেখা হলে বন্ধু প্রিয়া বলে কটাক্ষ করতে ছাড়ত না।

সেদিন নিউমার্কেটে দেখা হতে আমাকে ডেকে নিয়ে একটা রেষ্টুরেন্টে ঢুকল। কফির অর্ডার দিয়ে বলল, তারপর লিজা, তুমি এখানে কতদিন এসেছ? বাংলাদেশ কেমন লাগছে?

এমন সময় বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে কফিতে চুমুক দিতে দিতে চিন্তা করলাম, সফিকের বন্ধু আকমলওকি কালপ্রিট? সবকিছু জেনেও কী নাজানার ভান করছে?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আকমল নিজেই বলতে লাগল, সফিক যে এতবড় পাষণ্ড, এতবড় মিথ্যাবাদী, তা আমি কোনোদিন ভাবিনি। আচ্ছা, সফিক তো তোমাকে সেখানে বিয়ে করেছিল, তাই না?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

আকমল বলল, তুমি আমাকে হয়তো বিশ্বাস করবে না, কারণ আমিও বাংলাদেশের ছেলে। তবু বলছি, সফিক যে তার চাচার মেয়েকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চাচারই টাকায় পড়তে গিয়েছিল, সেকথা আমি জানতাম না। যদি জানতাম, তাহলে আমি তোমাকে তখনই সাবধান করে দিতাম। দেশে ফিরে জানতে পারি। এক সময় ওর সঙ্গে দেখা হতে জিজ্ঞেস করলাম, হাঁরে, সেখানে লিজার কি হবে? তার উত্তরে সফিক যা বলল, তা বললে আমারও মাথা হেঁট হয়ে যাবে। তুমি জেনেছ বোধ হয়, সে চাকরি নিয়ে স্বস্ত্রীক জাপান চলে গেছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ জানি।

আকমল জিজ্ঞেস করল, এখন তুমি কি করবে?

বললাম, নানি আমাকে দেশে ফিরে যেতে বলেছে। আমিও তাই ভাবছি।

আকমল বলল, তুমি সফিককে অত সহজে ছেড়ে দেবে কেন? সে যে এত বড় দুর্ব্যবহার তোমার সঙ্গে করল, সে জন্য কিছু করবে না? তাছাড়া ডিভোর্সের ব্যাপারটা নিস্পত্তি করে যাওয়াই উচিত।

বললাম, কি আর করব? তার চাচার কাছ থেকে সফিকের ঠিকানা নিয়ে চলে যাব। তারপর সেখান থেকে তাকে ডিভোর্সের জন্য চিঠি দেব। যাকে ভালবেসে বিয়ে করলাম, সে বেইমানী করলেও আমি তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমার প্রেমকে কলুষিত করতে পারব না।

আকমল বলল, নিজেকে সফিকের বন্ধু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করছে। যাই হোক, আমার মনে হয় তুমি এখানে আরও কিছুদিন থেকে সফিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ডিভোর্সটা নিয়ে যাওয়া ভালো। যদি চাও, বন্ধু হিসাবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। তারপর সে একটা কার্ড বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, দরকার মনে করলে আমাকে রিং করো। চল এবার উঠা যাক।

সেদিন চিন্তিত মনে আমি বাসায় ফিরি। রাত্রে চিন্তা করে ঠিক করলাম, ডিভোর্সটা নিয়েই দেশে ফিরবো।

পরের দিন আকমলের সঙ্গে যোগযোগ করলাম। সে আমাকে একজন উর্কিলের কাছে নিয়ে গেল। সেই উকিলের মাধ্যমে মাস দু'য়েকের মধ্যে আমি ডিভোর্সের কাগজ পত্র পেয়ে গেলাম। কিন্তু দেশে ফিরে যেতে পারলাম না। কারণ আকমল তখন আমাকে এমনভাবে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, তা থেকে আমি আজও নিজেকে মুক্ত করতে পারছি না। এতদিনে সে লণ্ডনের আমার সবকিছুর খবর জেনে নিয়েছে। নানা মারা যাওয়ার অনেক আগেই যে তার সবকিছু আমাকে দিয়ে গেছেন তাও জেনেছে। তাই নানান কৌশলে আমাকে আটকে রেখেছে। আমি দু-তিনবার গোপনে চলে যাওয়ার প্ল্যান করেছি, কিন্তু সফল হতে পারিনি।

আকমল খুব বড়লোকের ছেলে এবং নিজেও স্বাবলম্বি। স্মাগলিং দলের নেতা। ভীষণ ড্রিংক করে। তার অনেক গুণ্ডা আছে, তাদের কেউ না কেউ আমাকে দূর থেকে সব সময় নজর রাখে। এই যে, আজ আপনি এখানে এসেছেন, সে কথা তার লোক তাকে জানাবে। আমাকে বিয়ে করতে চায়। কয়েকবার সে কথা বলেছে। আমাকে নাকি সে ভীষণ ভালবাসে। আমাকে না পেলে বাঁচবে না। তার কথা শুনে আমার মনে হয়েছে, আমার চেয়ে আমার সম্পত্তির দিকে তার লক্ষ্য। সে যে ভীষণ লোভী, এতদিনে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। তবে আজ পর্যন্ত আমার দেহের দিকে হাত বাড়ায়নি।

জানেন, আমি চব্বিশ ঘন্টা অশান্তিতে ভুগছি। প্রথম যেদিন রাত্রে আপনি গাড়ি ঠিক করে দিয়েছিলেন, সেদিন আকমলই আমার গাড়িতে মদ খেয়ে বেঁহুশ হয়েছিল।

এমন সময় একজন সুঠামদেহী প্রৌড়া মেম সাহেব ঘরে ঢুকে গুড ইভিনিং বলে একটা সোফায় বসল। উনি বাইরে থেকে সবে মাত্র ফিরে লিজাকে কারও সঙ্গে কথা বলতে শুনে এখানে এলেন।

রফিক তার দিকে চেয়ে বলল–গুড ইভিনিং।

লিজা বলল, আমার নানী। আমার বিপদের কথা শুনে আমাকে নিয়ে যেতে কয়েকদিন হল এসেছে। তারপর নানীকে বলল, ইনি মিঃ রফিক। বাঙালীদের মধ্যে একটা ব্যতিক্রমধর্মী যুবক। এরই কথা তোমাকে একদিন বলেছিলাম

নানি হাউ ফাইন বলে হ্যাণ্ডসেক করার জন্য রফিকের দিকে হাত বাড়াল। রফিক হ্যাণ্ডসেক না করে দুহাত তুলে মোনাজাতের মত করে বলল–হাদাকাল্লাহ।

নানি বেশ অবাক হয়ে বললেন, তুমি হ্যাণ্ডসেক না করে আমাকে অপমান করলে কেন?

রফিক বলল, আপনাকে অপমান করার জন্য কিছু করি নাই। কোনো বেগান পুরুষের সঙ্গে কোনো বেগানা নারীর হ্যান্ডসেক করা ইসলামের আইনের পরিপন্থী।

নানি বললেন, বোঝা যাচ্ছে তুমি গোঁড়া মুসলমান।

রফিক বলল, গোঁড়া হলে আমি আপনার নাতনির সঙ্গে আসতাম না।

নানি বললেন, তা হয়তো ঠিক, কিন্তু তুমি দু'হাত তুলে কি যেন বললে?

বললাম, হাদাকাল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে সৎ পথ প্রদর্শন করুন।

হোয়াট, আমি কি তাহলে অসৎ পথে রয়েছে?

আছেন কি না জানি না, তবে হাদিস পড়ে জেনেছি, আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলিয়াছেন, ইসলাম ধর্ম প্রচার ও কুরান মজিদ নাজিল হওয়ার পর পৃথিবীর সব ধর্ম ও ঐশীগ্রন্থ বাতিল হয়ে গেছে। তিনি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে কুরআনের উপর বিশ্বাস এনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেছেন। যে কেউ এই আদেশ অমান্য করে স্ব স্ব ধর্মে থাকবে, তারা প্রথভ্রষ্ট। পরকালে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে"।

নানি বললেন, তুমি আমাদের বাইবেলও যীশুখৃষ্টকে অস্বীকার কর? না, তা করিনা শুধু পৃথিবীর সব পয়গম্বর ঐশীগ্রন্থকে বিশ্বাস করি। কারণ আল্লাহ কুরআন মজিদে আল্লাহ শেষ-নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে আহ্বান করে বলিয়াছেন, "আপনি বলিয়া দিন, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি, আর উহার প্রতি যাহা আমাদের উপর নাযিল করা হইয়াছে, আর উহার প্রতি যাহা নাজিল করা হইয়াছে ইবরাহীম ও ইসমাইল ও ইসাহাক ও ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণকে, তাঁহাদের রবের নিকট হইতে। আমরা তাহাদের কাহারও মধ্যে (ঈমান আনায়নে) পার্থক্য করিনা এবং আমরা তো আল্লাহরই অনুগত। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করিবে, তবে উহা তাহা হইতে গৃহিত হইবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হইবে। ১"

এখন বুঝতে পারছেন মুসলমানরা সব নবী ও সব ঐশীগ্রন্থ বিশ্বাস করে। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীতে কুরআন মজীদ ছাড়া যে সমস্ত ঐশীগ্রন্থ রয়েছে, সেগুলো আসল

ঐশীগ্রন্থ নয়। তাতে মানুষ হিংসা ও স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বেশীরভাগ বদলে ফেলে নিজেদের মতবাদ ঢুকিয়েছে। যেমন কিছুদিন আগে আমি বাইবেলের নতুন সংস্করণের বাংলা অনুবাদ পড়লাম। তাতে এমন অনেক কিছু আছে যা কুরআন মজীদের উল্টো। এ রকম তো হওয়ার কথা নয়। সব থেকে বড় একটা কথা পেলাম। সেটা হল, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যে শেষ নবী হিসাবে আবির্ভূত হবেন, সে কথাও লেখা নেই অথচ আগে তা ছিল। হযরত মুহম্মদ (দঃ) বলেছেন– 'আমার আগমনের কথা আমার পূর্বে সব নবীরা ভষ্যিৎবাণী করে গেছেন এবং আগের সব ঐশীগ্রন্থের সে কথা উল্লেখ আছে।" হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর কথা কোনো দিন মিথ্যা হতে পারে না, তার অতি বড় দুষমণও তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে নাই।

যেমন আল্লাহ কুরআন মজিদে বলিয়াছেন, "আর যখন মরিয়মের পুত্র ইসা বলিলেন, হে বনি ইসরাইলগণ, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত (রসূল) রূপে আগমন

(১) সরা-আল-ইমরান, ৮৪/৮৫ আয়াত, পারা-৩

করিয়াছি, আমি সত্যতা প্রতিপদ কারী আমার পূর্ববর্তী তৌরাতের এবং আমার পরে যে একজন রাসূল আগমন করিবেন, আমি তাহার সুসংবাদ প্রদানকারী, যাহার নাম আহম্মদ হইবে। অনন্তর যখন তিনি তাহাদের নিকট সুষ্ট নিদর্শনাবলী আনায়ন করিলেন, তখন তাহারা বলিতে লাগিল ইহা সুষ্ট যাদু (১)"।

লিজা বলল, ক্বুরআন যে বদলায়নি বা বদলাবে না, তার কোন সিওরটি আছে না কি?

অফকোর্স, মৃত্যুর আগে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন অন্যান্য ঐশীগ্রন্থের ন্যায় ক্বুরআন মজীদ বদলে যাওয়ার ভয়ে চিন্তিত হলেন, তখন আল্লাহ জিব্রাইল (আঃ) ফেরেস্তাকে দিয়ে বলে পাঠালেন, "আমার হাবিবকে চিন্তা করতে নিষেধ করে তাঁকে শুনিয়ে দাও–কোরানের হেফাজত চিরকাল আমি করব। পৃথিবীর কেউ কোন কালে এর একটা অক্ষরও বদলাতে পারবে না।" ক্বুরআনে আছে, আমিই ক্বুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই উহার রক্ষক। (২)" আল্লাহর বানী যে সত্য, আজ বিজ্ঞানের অভিনব আবিস্কার কমপিউটার তা বলে দিয়েছে। আপনারা কি শোনেন নি? ক্বুরআন মজীদকে যখন কমপিউটারে দিয়ে প্রশ্ন রাখা হল, এটা সত্য ঐশীগ্রন্থ কিনা, এতে কোনো ভুল আছে কি না, এর মধ্যে কোনো রদ বদল হয়েছে কিনা?

তখন কমপিউটার রেজাল্ট দিল, হ্যাঁ, এটা সত্য ঐশীগ্রন্থ, এর এক বর্ণও ভুল নেই, আর আজ পর্যন্ত এর কোনো অংশ রদ-বদল হয়নি।

রফিকের কথা শুনে তার প্রতি নানি-নাতনির ভক্তি ও বিশ্বাস অনক বেড়ে গেল।

নানি বললেন,, লিজার মুখে শুনেছি, তুমি শিক্ষিত বেকার। এখন কি করছ জানি না, তবে আমি তোমাকে আমাদের ব্যবসাতে একটা ভালো জব দিতে পারি। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে?

রফিক বলল, সে কথা ভেবে, চিন্তে পরে জানাব। আপাততঃ আমি একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করছি। আমার কথা এখন থাক। লিজার কাছে যা শুনলাম, তাতে করে এখান থেকে আপনারা নিরাপদে কি করে ফিরে যাবেন, সে কথা ভাবুন। আপনারা এ ব্যাপারে বৃটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিপদের কথা সবিস্তারে জানিয়ে তার কাছে সাহায্য চান। আপনারা আমাদের দেশের মেহমান। আপনাদের কোনো রকম অসুবিধা বা ক্ষতি হোক, তা আমি চাই না। যতদূর পারি আপনাদেরকে সাহায্য করবো।

লিজা বলল, নানি বৃটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করে সব ব্যাপার জানিয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু এই কথা আকমল জানতে পেরে আমাদের শাসিয়ে গেছে, "আমি যদি তাকে বিয়ে না করি, তবে প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারব না।"

রফিক বলল, আপনারা চিন্তা করবেন না। যাওয়ার প্রস্তুতি নিন। আমি সব সময় আপনাদের পাশে থাকব। দেখি কি করে আকমল আর তার লোকজন আটকায়।

নানি বললেন, তোমার সৎসাহস দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি ভাই। কিন্তু তমি গরিব ও একা। কি করে বিরাট পয়সাওয়ালা আকমল ও তার লোকজনের সঙ্গে লড়বে। শেষে আমাদেরকে সাহায্য করতে এসে নিজে বিপদে পড়ে প্রাণ হারাবে। তবে আমরা তোমাকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারি।

রফিক বলল, টাকা পয়সা যদি প্রয়োজন হয় তখন দেখা যাবে। আমার বিপদের কথা বলছেন? বিপদকে আমি ভয় করি না। তাছাড়া বিপদ থেকে কাউকে উদ্ধার করতে হলে

(১) সূরা-সফ, ৬নং আয়াত, পারা-২৮
(২) সূরা-হিজর, ৯নং আয়াত, পারা-১৪

বিপদের মধ্যে তো তাকে যেতেই হবে। আর মৃত্যুর জন্যও আমি চিন্তা করি না। কারণ আল্লাহপাক তাঁর বাণীতে বলেছেন, "জন্ম, মৃত্যু, ধন–দৌলত, রিজিক ও ইজ্জত আমার হাতে। মানুষ শত চেষ্টা করে তা আয়ত্বে আনতে পারবে না।"

আমার মৃত্যু যদি তিনি আকমল বা তার লোকের হাতে রেখে থাকেন, তাহলে পৃথিবীর কেউ যেমন ঠেকাতে পারবে না, তেমনি আমার হায়াত থাকলে কেউ মেরে ফেরতেও পারবে না। আচ্ছা, আজ চলি। কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল। আবার আসব। হ্যাঁ, ভালো কথা আকমলের ঠিকানাটা দিন তো।

নানি লীজাকে ঠিকানা দিতে বলে ভিতরে যাওয়ার সময় রফিককে বললেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেও না।

লীজা ড্রয়ার টেনে কাগজ কলম বের করে ঠিকানা লিখে রফিকের হাতে দেওয়ার সময় বলল, এটা অফিসের ঠিকানা। বাসায় সে খুব কম থাকে। তারপর আবার বলল, আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে। কেবলই মনে হচ্ছে, আমাদের বিপদের মধ্যে আপনাকে জড়িয়ে আপনারও বিপদ ডেকে আনছি।

রফিক মৃদু হেসে বলল, আপনি শিক্ষিত বিদেশিনী। আপনাদের দেশের মেয়েরা সহজে ভয় পায় না জানি।

লীজা বলল, আপনি যদি আমার অবস্থায় পড়তেন, তাহলে কি করতেন?

রফিক বলল, ধৈর্য্য ধরে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে বিপদের মোকাবেলা করতাম। বিপদকে ভয় করলে চলবে না। কারণ ভাগ্যে যা আছে তা যখন হবেই তখন আর বিপদকে ভয় করব কেন?

লিজা বলল, আচ্ছা, আপনি কথায় কথায় আল্লাহ, ভাগ্য এইসব কথা বলেন কেন? যদি আল্লাহ বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন, তাহলে তিনি আবার মানুষকে বিপদে ফেলেন কেন?

রফিক বলল, মানুষ ভুল বা অন্যায় কাজ করে বিপদ ডেকে আনে। আল্লাহপাক কোরান মজীদে বলিয়াছেন, "আর তোমাদের উপর যে কোনো বিপদ আপপিত হয়, তাহা তোমাদেরই হস্তের অর্জিত কার্য সমূহের দরুণ এবং বহু বিষয় ত তিনি ক্ষমা করিয়া দেন। (১)"

আপনার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে আপনি ঐসব বিশ্বাস করেন না। আপনি কি বাইবেল পড়েন না? কখনও গীর্জায় যান না? পাদ্রিদের উপদেশ শুনেন না?

এমন সময় নানি আয়ার সঙ্গে কফির সরঞ্জাম নিয়ে এসে রফিকের প্রশ্নগুলো শুনে বললেন, না, ও কখনও গীর্জায় যায় নি। তারপর কফি বানিয়ে রফিকের দিকে বাড়িয়ে বললেন, নাও ভাই, কফি খাও। তুমি কি আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে?

না–না, ওসব ঝামেলা করবেন না। আজ থাক, অন্য দিন হবে। কফি খেয়ে লিজাকে বলল, আপনি আর কখনও ঐ বদ খেয়াল করবেন না। তারপর নানিকে বলল, আপনি ওর দিকে নজর রাখবেন। একা একা বাইরে যেতে দেবেন না। আচ্ছা, এবার আসি, আল্লাহ হাফেজ" বলে সে উঠে দাঁড়াল।

লিজ বলল, আবার কবে আসছেন?

শীঘ্রি আসতে চেষ্টা করব বলে রফিক তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরল।

(১) সূরা-শুরা, ৩০ নং আয়াত, পারা–২৫

কয়েকদিন পর রফিক আকমলের অফিসে গেল। আকমল অফিসেই ছিল। পিয়নের হাতে একজন অপরিচিত লোকের স্লীপ পেয়ে প্রথমে একটু চিন্তা করল। তারপর তাকে পাঠিয়ে দিতে বলল।

রফিক রুমে ঢুকে সালাম দিয়ে এগিয়ে এল।

আকমল সালামের জওয়াব দিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে বলল, আপনাকে তো চিনতে পারছি না। কি দরকারে এসেছেন বলুন।

রফিক অফিসে ঢুকে সবকিছু দেখে নিয়েছে। বিদেশী কায়দায় সাজান। মেঝেতে দামী কার্পেট। রুমটা এয়ারকণ্ডিশান করা। আকমলের প্রশ্ন শুনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

তাকে চুপ করে ঐভাবে চেয়ে থাকতে দেখে আকমল বিরক্ত বোধ করে আবার বলল, কি ব্যাপার চুপ করে আছেন কেন?

রফিক দৃষ্টি সংযত করে জিজ্ঞেস করল, আপনি এই অফিসের মালিক আকমল সাহেব?

হ্যাঁ, কেন বলুন, তো?

রফিক কোনো ভূমিকা না করে বলল, আমি লিজার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

অচেনা আগন্তুকের মুখে লিজার নাম শুনে আকমলের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। রাগে কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারল না। তারপর গম্ভীরস্বরে বলল, লিজাকে আপনি চিনলেন কি করে? কতদিন থেকে তার সঙ্গে পরিচয়? আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?

লিজার সঙ্গে এক সপ্তাহ আগে পরিচয় হয়েছে। আর আমি, একজন সাধারণ মানুষ, নাম রফিক।

ও বলে আকমল কি যেন চিন্তা করল। তারপর বলল, দেখুন রফিক সাহেব, দেখে মনে হচ্ছে, আপনি একজন ভদ্রঘরের এডুকেটেট ম্যান। আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবেন না। ভদ্রঘরের ছেলে ভদ্রভাবে এখান থেকে চলে গেলে ভালো করবেন। আমার নষ্ট করার মত সময় অত নেই। শেষ বারের মত আবার বলছি, লিজার সঙ্গে আর কোনো দিন দেখা করবেন না। তাদের বাসাতেও যাবেন না। আপনি তাহলে কয়েকদিন আগে লিজার সঙ্গে তাদের বাসায় গিয়েছিলেন? বাসায় নিয়ে গিয়ে বুঝি আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে? যাই হোক, যা খুশি বলুক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। জেনে রাখুন, লিজা আমার বাগদত্তা। তার দিকে কেউ নজর দিলে আমি তার চোখ উপড়ে ফেলব। আশা করি, আমার কথা বুঝতে পেরেছেন। যান, এবার আসতে পারেন।

আকমলের কথা শুনে রফিক ভিতরে ভিতরে খুব রেগে যাচ্ছিল। কিন্তু তা বাইরে প্রকাশ না করে বলল, আমাকে ভয় দেখিয়ে কোনো ফল হবে না। কারণ আল্লাহ ছাড়া আমি আর কাউকে ভয় করি না। আপনি যতবড় শক্তিশালী হন না কেন, আল্লাহপাকের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। তিনি সত্যের পথের পথিকের সহায়ক। আমি যদি সত্য পথের পথিক হয়ে থাকি, তাহলে তাঁর সাহায্যে আমি কৃতকার্য হবই। দেখব, আপনি আমার কি ক্ষতি করতে পারেন।

রফিকের কথায় আকমল অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলল, ফড়িং এর পাখা গজায় মরার জন্য। লিজার রূপ ও ঐশ্বর্য্য তোমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। যাও এখান থেকে, নচেৎ দারোয়ান ডাকতে বাধ্য হব।

রফিক বলল, তার আর দরকার হবে না, আমি চলে যাচ্ছি। অমন অভদ্র ভাষায় কথা বলছেন কেন? ভদ্রতা শেখেন নি বুঝি? কথা শেষ করে দৃঢ় পদক্ষেপে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। তারপর বৃটিশ হাইকমিশনারের অফিসে গিয়ে লিজা ও আকমলের ব্যাপারটা খুলে বলল।

সব শুনে হাইকমিশনার বললেন, লিজার নানি কয়েকদিন আগে এসে ছিলেন। তিনি এত সব ব্যাপার আমাকে বলেন নি। আপনি ওদেরকে সব কাগজপত্রসহ নিয়ে আসুন। আমি বাংলাদেশ পরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে ঘটনাটা নিয়ে কথা বলব। বাই দি বাই, লিজাদের সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়? আর আপনিই বা কেন তাদের জন্য এতকিছু করছেন?

রফিক বলল, লিজার সঙ্গে প্রথম দেখা দেড় বছর আগে। একরাত্রে রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় আটকা পড়েছিলেন। আমি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। বুঝতে পেরে সারিয়ে ঠিক করে দিই। তখন কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় হয়নি। পরেরদিন আমি নিউমার্কেটে আমার এক বন্ধুর লাইব্রেরীতে তার সঙ্গে চাকুরীর ব্যাপারে আলাপ করেছিলাম। সেখানে লিজা বই কিনতে গিয়ে আগের থেকে ছিল। আমাদের আলাপের কথাগুলো হয়তো উনি শুনেছিলেন। তাই ঐদিন রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে একটা কার্ড দিয়ে বললেন, আপনি তো চাকরি খুঁজছেন? সময় করে এই ঠিকানায় একদিন আসুন। আমি আপনাকে একটা চাকরি দিতে পারব। পরেরদিন তাদের বাসায় গিয়েছিলাম। কিন্তু কাজটা পছন্দ হয়নি বলে চলে আসি। তারপর এই সপ্তাখানেক আগে একটা মসজিদ থেকে নামায পড়ে বের হওয়ার সময় দেখি, লিজা মসজিদের ভিতর উদভ্রান্তের মত বসে আছে, আর মুসুল্লিরা হৈ চৈ করছে তাকে বের করার জন্য। আমি লিজাকে চিনতে পেরে সঙ্গে করে তাদের বাসায় পৌঁছে দিতে যাই। সেদিন সে সব কথা আমাকে জানিয়ে আমার কাছে সাহায্য চায়। আমি তাকে কথা দিয়েছি, তারা যাতে ভালভাবে দেশে ফিরে যেতে পারে তার জন্য সব রকমের সাহায্য করব।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলব, কেউ যদি বিপদে পড়ে কারো কাছে সাহায্য চায়। তাকে সাহায্য না করাটা কি কাপুরুষের পরিচয় নয়? আল্লাহর রাসূল হযরত মহাম্মদ (দঃ) বলেছেন, "ঘাতক শত্রুও যদি বিপদে পড়ে তোমার কাছে সাহায্য চায়, তখন শত্রুতা ভুলে গিয়ে তাকে সাহায্য করবে।"

আমরা তাঁর উম্মত হয়ে যদি তাঁর আদেশ অমান্য করি, তাহলে তাকে অবমাননা করা হবে না কি? তাছাড়া ওদের কিছু একটা অঘটন হলে বিদেশে বাংলাদেশের দুর্ণাম হবে। এই দেশের নাগরিক হয়ে আমি নিশ্চয় তা কামনা করব না।

বৃটিশ হাই কমিশনার বললেন, আপনার কথা শুনে আমি খুব খুশী হলাম। আপনি এখন আসুন, যা বললাম তাই করুন।

সেখান থেকে বেরিয়ে রফিক লিজাদের বাসায় গেল।

লিজা বারান্দা থেকে তাকে দেখতে পেয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলল, রফিক তুমি এসেছ? কেমন আছ বল? এতদিন আসনি কেন? আমি তো সর্বক্ষণ তোমার অপেক্ষায় প্রহর গুণছি।

লিজার উচ্ছ্বাসভাব এবং তুমি সম্বোধনে রফিকের মনটা ধক করে উঠল। তখন তার মনে হল, কয়েকদিন যদি কোনো কারণে রোকেয়ার সঙ্গে দেখা না হত, তাহলে রোকেয়াও ঠিক এইরকম করে জিজ্ঞেস করত। লিজা যেন রোকেয়ার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল। সে কয়েক সেকেণ্ড আনমনা হয়ে লিজার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তরপর সামলে নিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল, একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করলে কি আর উত্তর দেওয়া যায়? আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। চলুন বসা যাক, কথা আছে। আপনারা ভালো আছেন?

লিজা রফিকের ভাবান্তর লক্ষ্য করে উচ্ছ্বাসভাবটা সামলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, ভালো আছি।

লিজার ভাবান্তরও রফিক লক্ষ্য করে তাকে খুশি করার জন্য বলল, আপনি কিন্তু

বাঙালীদের মতো বাংলা বলতে পারেন।

লিজা বলল, সফিকের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে বাংলা শিখতে আরম্ভ করি। আমি তার সঙ্গে সব সময় বাংলায় কথা বলতাম। তারপর এখানে এসে প্রচুর বাংলা বই পড়ছি। কথা বলতে বলতে তারা ড্রইং রুমে ঢুলক। রফিক একটা সোফায় বসার পর লিজা তার পাশে গা ঘেঁসে বসে পড়ল। রফিক একটু সরে বসে বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনি সামনের অথবা পাশের সোফায় বসুন।

লিজা আর্শ্চয্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন? এখানে বসলে তোমার কোনো অসুবিধে আছে?

না, আমার কোনো অসুবিধে নেই। তবে, বলে সে চুপ করে গেল।

চুপ করে গেলে কেন? প্লীজ বল।

এমন সময় নানি এসে বললেন, তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

নানির কথা শুনে রফিক চমকে উঠল। লজ্জায় সে কোনো কথা বলতে পারল না।

লিজা বলল, জান নানি রফিক আমাকে ওর পাশ থেকে উঠে অন্য সোফায় বসতে বলছে। তার কারণ জিজ্ঞেস করে উত্তর পাচ্ছি না।

নানি রফিককে বললেন, তুমি ভাই কারণটা বলত, আমারও শুনতে ইচ্ছে করছে।

বলাবাহুল্য লিজা ও রফিক যখন একসঙ্গে থাকে তখন তারা বাংলায় কথা বলে। আর যখন নানি তাদের সঙ্গে থাকে তখনই সবাই ইংরেজীতে কথা বলে। কারণ নানি বাংলা একদম জানেন না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে নানি আবার বললেন, কি হল? কিছু বলছ না কেন?

রফিক বলল, প্রত্যেক মানুষের উচিত তাঁর নিজের ধর্ম মেনে চলা। আমার ধর্ম ইসলাম। ইসলাম ধর্মের আইন হল, "মোহররম ছাড়া কোনো নরনারী একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে এবং এভাবে বসতেও পারবে না।"

লিজা জিজ্ঞেস করর, মোহররম শব্দের অর্থ কি?

ক্বুরআনের ভাষায় মোহররম ব্যক্তি চৌদ্দজন। যাদের সংগে বিয়ে হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ। এই চৌদ্দজন ছাড়া যে কোন সম্পর্কে বিয়ে জায়েজ অর্থাৎ সিদ্ধ।

লিজা আবার জিজ্ঞেস করল, এই চৌদ্দজন কারা?

রফিক বলল, (১) আপন মা, সৎ মা, দাদি ও নানি (২) আপন কন্যা, কন্যার কন্যা যত নিচে যাবে, (৩) সহোদরা বোন, বৈমাতৃ ও বৈপিতৃয় বোন, (৪) আপন ফুফু ও পিতার উক্ত তিন প্রকার বোন, (৫) আপন খালা ও মায়ের উক্ত তিন প্রকার বোন (৬) আপন ভাইয়ের কন্যা ও উক্ত তিন প্রকার ভাইয়ের কন্যা (৭) আপন বোনের কন্যা ও উক্ত তিন প্রকার বোনের কন্যা, (৮) দুধমা (দুই বছর বয়সের মধ্যে যার দুধ পান করেছিল, (৯) দুধমায়ের কন্যা ও দুধ দাদি-নানি, (১০) শাশুড়ী ও স্ত্রীর আপন দাদি, নানি (১১) স্ত্রীর পূব স্বামীর পক্ষের কন্যা ও কন্যার কন্যা যত নিম্নে যাবে, (১২) আপন ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও তৎপুত্রের স্ত্রী, (যত নিম্নে যাবে), (১৩) সহোদরা দুই বোনকে একসঙ্গে বিবাহ করা, (১৪) যে মেয়ের স্বামী আছে (সধবা)। ইসলামের বিধান মতে এই চৌদ্দজনকে বিবাহ করা হারাম।

কথা শেষ হতে নানি লিজাকে উঠে অন্য সোফায় বসতে বললে, সে মুখ ভার করে একবার রফিকের দিকে চেয়ে পাশের সোফায় বসল।

আয়া নাস্তা ও কফি ট্রেতে করে নিয়ে এলে নানি সবাইকে পরিবেশন করলেন।

নাস্তা খাওয়ার পর আকমল ও বৃটিশ হাইকশিনারের সঙ্গে যা কিছু কথা-বার্তা হয়েছে রফিক তাদেরকে বলল।

নানি বললেন, আকমলের ব্যাপারে তুমি খুব সাবধান থেক। আমাদেরকে নিয়ে তুমি কবে হাইকশিনারের কাছে যেতে চাও?

আগামীকাল চলুন। আমি সকাল নটায় আসব। আপনারা তৈরি থাকবেন।

লিজা হঠাৎ বাংলায় বলে উঠল রফিক, তুমি কিন্তু ব্রেকফাষ্ট আমাদের.....।

রফিক তাকে থামিয়ে দিয়ে ইংরেজিতেই বলল, মিস লিজা, ভদ্রভাবে কথা বলুন। এবার বলুন কি বলতে চাচ্ছেন।

লিজা অপমান বোধ করে গম্ভীর হয়ে রফিকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

কই বলুন, আমার কাজ আছে, আমাকে এখন উঠতে হবে।

নানি লিজার বাংলা কথা বুঝতে না পারলেও রফিকের কথা শুনে বুঝতে পারল, লিজা তাকে অসম্মানজনক কিছু বলেছে। তাই লিজাকে বললেন, রফিক ঠিক কথা বলেছে। তুই ওকে অসম্মান করছিস কেন? ও আমাদের জন্য যা করছে, সে ঋণ কি আমরা শোধ করতে পরব?

লিজা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁফিয়ে উঠে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল।

রফিক কিছু বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে নানির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

রফিক চলে যাওয়ার পর নানি লিজার রুমে গিয়ে দেখল, সে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রয়েছে, আর তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত রেখে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি তুই রফিকের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিস।

লিজা কিছু না বলে একইভাবে কাঁদতে লাগল।

নানি বললেন, তুই একবার বাঙালীকে বিশ্বাস করে নিজের জীবন নষ্ট করতে চলেছিলি। আবার সেই বাঙালীর দিকে ঝুকে পড়েছিস। কান্না থামা। আমার কথার জওয়াব দে। রফিককে তুই কতদিন থেকে চিনিস? তাকে কতটা জেনেছিস?

লিজা কান্না থামিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিথর হয়ে রইল। তারপর নানিকে জড়িয়ে ধরে বলল, সব মানুষ এক রকম হয় না। আমি সফিককে চিনতে ভুল করেছিলাম এ কথা ঠিক, কিন্তু রফিক অন্য জগতের মানুষ। একরাতে আকমল আমাকে কৌশলে ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিল। ড্যান্সের শেষে সে কি মদ খাওয়া। আমাকেও খাওয়াবার জন্য অনেক চেষ্টা করে। আমার গ্যাস্টিক আছে, খেলে খুব অসুবিধে হবে বলে কোনো রকমে কাটিয়েছি। শেষে আকমল পাঁড় মাতাল হয়ে কোনো রকমে গাড়িতে উঠে বলল, প্লীজ লিজা, তুমি ড্রাইভ কর।

তখন আমি তার বাসায় থাকতাম। ভয় দেখিয়ে জোর করে সে আমাকে হোটেল থেকে তার বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। একরাতে মাতাল হয়ে আমার রুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, লিজা দরজা খোল, তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।

ধাক্কার শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আকমলের জড়ান জড়ান কথা শুনে ঘটনাটা অনুমান করে সাড়া দিলাম না। সারা রাত দরজায় গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরের দিন সে অফিসে চলে যাওয়ার পর গোপনে এই বাসা ভাড়া ঠিক করে একদিন চলে আসি।

দুদিন পর আকমল খোঁজ করে এখানে এসে বলল, সে রাতের জন্য আমি দুঃখিত। এভাবে তোমার চলে আসা ঠিক হয়নি। সেখানে তোমার অসুবিধা হচ্ছে, সে কথা তুমি আমাকে জানাতে পারতে। আমি বাসা ঠিক করে দিতাম।

যাই হোক ঐ রাত্রে ক্লাব থেকে আমি ড্রাইভ করে আসছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। তখন শীতকাল। রাত প্রায় একটা। রাস্তায় কোনো লোকজন নেই। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু গাড়ি কিছুতেই চলল না। এমন সময় একটা যুবক রাস্তার ফুটপাত দিয়ে যাচ্ছিল। সে আমার বিপদের কথা বুঝতে পেরে কাছে এসে ইংরেজীতে বলল, গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে বুঝি? আপনি স্টার্ট দিন, আমি ঠেলে দিচ্ছি। অনেকটা ঠেলার

পরও যখন ষ্টার্ট নিল না, তখন ইংরেজীতেই বলল, ম্যাডাম, আপনি নেমে আসুন, আমি দেখছি।

প্রথমে আমার ভয় করছিল। কারণ অত রাত্রে কেউ কোথাও নেই। আকমল তো নেশায় বেহুশ।

আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে যুবকটা আবার বলল, ভয় নেই, গাড়িটা স্টার্ট দিতে পারি কি না একটু দেখব।

আমি নেমে দাঁড়ালাম।

যুবকটা গাড়িতে উঠে দু'একবার স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করে দোষ ধরে ফেলে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে ইঞ্জিনের হুড খুলে দোষটা সারিয়ে দিয়ে বলল, উঠে পড় ন, অল আর ওকে।

আমি উঠে স্টার্ট দিয়ে বুঝতে পারলাম, তার কথা সত্য। তাকে একশ টাকা দিতে গেলাম। সে নিল না। ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। সেদিনের সেই যুবকটিই রফিক। কি দারুণ শক্তি ওর গায়ে। যখন গাড়িটা ঠেলছিল তখন মনে হল যেন কয়েকজন ঠেলছে। তুমি বলতো নানি তাকে দেখলে কি মনে হয়, সে খুব শক্তিশালী?

নানি বললেন, তা অবশ্য মনে হয়নি। কিন্তু তার সঙ্গে তোর পরিচয় হল কি করে?

লিজা তারপরের দিনের নিউমার্কেটের লাইব্রেরীর ঘটনা থেকে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার ও এখানে তাদের দু'জনের যা কথাবার্তা হয়েছে তা সব বলল।

নানি বললেন, তাহলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ হয় নি?

তুমি কি বলছ নানি? মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেব রফিক? দেখলে না, কথায় কথায় শুধু ধর্মের আইনের কথা শুনিয়ে দেয়। অথচ কি আশ্চর্য্য, মোল্লা-মৌলবীদের মত গোঁড়া নয়। তুমি যাই বল, আমার মনে হয় ইসলাম ধর্মের আইনগুলো মানুষের জন্য খুব কল্যাণকর।

নানি বললেন, হয়তো হবে। তবে একটা কথা তোর নানার মুখে শুনেছিলাম, একবার আমেরিকায় সারা পৃথিবীর বিদ্যান ব্যক্তিদের একটা খুব বড় কনফারেন্স হয়েছিল। সেখানে একশত জন সবদিক থেকে সর্বকালের সর্ব বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নাম লিষ্ট করা হয়। সেই লিষ্টের এক নাম্বারে যে নামটা লেখা হয়েছিল সেটা ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর নাম।

লিজা অবাক হয়ে বড় বড় চোখ করে বলল, সত্যি নানি?

হ্যাঁরে, সত্যি। এ কথা তো পৃথিবীর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

লিজা আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তবে কেন সারা পৃথিবীর মানুষ তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করছে না?

আমিও তোর নানাকে সে কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তোর নানা বলল, নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা তা করছে না।

তুমি হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর জীবনী পড়েছ?

না পড়িনি, ভাবছি পড়ব।

লিজা বলল, আজকেই মার্কেট থেকে কিনে আনব।

তাই আনিস বলে নানি সেখান থেকে চলে গেলেন।

রফিক বেরিয়ে যাওয়ার পর আকমল তার একজন লোককে বলল, যে ছোকরাটা এইমাত্র বেরিয়ে গেল, তার নাম রফিক। তাকে ফলো করো। সে সারাদিন কোথায় থাকে, কি করে এবং তার বাসার ঠিকানা সবকিছু জেনে আসবে। খুব সাবধান, মনে হয় ছোকরাটা খুব চালাক।

তাই হবে স্যার বলে জাফর নামে তার পোষা গুণ্ডাটা বেরিয়ে গেল। সে সারাদিন রফিককে ফলো করে শেষে রাত্রে যখন রফিক বাসায় ফিরল, সেও তখন রফিকের বাসা দেখে এসে পরের দিন আকমলের কাছে রিপোর্ট করল।

রাগে আকমলের চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠল। বলল, ঠিক আছে, তুমি প্রতিদিন সে বাসায় না ফেরা পর্যন্ত তাকে ফলো করবে। আর যদি পার ধরে আমাদের আড্ডায় নিয়ে আসবে। যদি একা সামলাতে পারবে না বলে মনে কর, তাহলে জালালকে সঙ্গে নিতে পার।

জাফর বলল, ঐ পুচকে ছোঁড়াকে আমি একাই কাবু করতে পারব স্যার। দেখবেন কালকেই তাকে আপনার পায়ে এনে ফেলব।

আকমল বলল, তাই কর, তবে সাবধান, কেউ যেন টের না পায়।

ও কে বস বলে জাফর চলে গেল।

পরের দিন ঠিক বেলা নটায় রফিক লিজাদের বাসায় গিয়ে হাজির হল। তারা তখন ব্রেকফাষ্ট করছিল। রফিককে তাদের সঙ্গে খেতে বলল।

রফিক বলল, ধন্যবাদ, এক্ষুনি খেয়ে আসছি।

লিজা শুনল না। খাওয়া থেকে উঠে তাকে ডিমের মামলেট ও কফি দিয়ে বলল, খাওয়ার পরেও এগুলো খাওয়া যায়।

অগত্যা, রফিককে খেতে হল। খাওয়ার পর সবাই মিলে বৃটিশ হাইকমিশনারের কাছে গেল।

তিনি তাদের কাগজ পত্র দেখে বললেন, আমি পররাষ্ট্র সচিবের কাছে পাঠাবার জন্য একটা নোট লিখে রেখেছি। আপনারা বিপদের কথা লিখে বাংলাদেশ সরকারের কাছে নিরাপদে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য সাহায্য চেয়ে একটা এ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যান। আমি সেটা আমার নোটের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। তাতে আকমলের সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ ও তার ঠিকানা লিখবেন। তিনি একখানা সাদা কাগজ দিলেন।

নানি লিজার কাছ থেকে আকমলের সবকিছু জেনে নিয়ে এ্যাপ্লিকেশন লিখে তখনই দিয়ে দিলেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে এসে রফিক বলল, আপনারা বাসায় যান, আমি আমার অফিসে যাব।

লিজা কিছু বলতে যাচ্ছিল, নানি তাকে থামিয়ে দিয়ে রফিককে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কিছু কথা আছে, আমাদের সঙ্গে বাসায় চল।

রফিক বলল, পরে বললে হত না। গতকাল অফিস কামাই করেছি। আবার আজও তাহলে তাই হবে। আপনিই বলুন অফিস কামাই করা কি উচিত?

নানি জিজ্ঞেস করলেন, কামাই করলে বেতন কাটা যাবে বুঝি?

রফিক বলল, তারা বেতন কাটবে কি. আমিই তো এ্যাবসেন্ট ডের বেতন নিই না। কারণ কাজ না করে মজুরী নেওয়াটা আমার বিবেকে বাধে। অবশ্য সাহেব পুরো বেতন দিতে এ্যাকাউন্টটেন্টকে বলেন, কিন্তু আমি নিই না।

নানি বললেন অফিস কামাই হোক, তবু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

রফিক আর কিছু না বলে গাড়িতে উঠল।

ড্রইং রুমে নানি ও রফিক মুখোমুখি দুটো সোফায় বসল। লিজা ড্রেস চেঞ্জ করার জন্য ভিতরে চলে গেল।

নানি বলেন, তোমাকে যে কথা বলার জন্য নিয়ে এলাম তা বলব। তার আগে লিজার কথা একটু বলে নিই। ও খুব সরল। মনের মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। ছেলেবেলা থেকে বাইরের ছেলেমেয়ের সঙ্গে তেমন একটা মেলামেশা করে নি। সব সময় পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। কি করে যে সফিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ভেবে পাই না। নিজে সৎ বলে সবাইকে তাই মনে করে। সেইজন্য বোধ হয় সফিক ওকে অত বোকা বানিয়ে কাজ হাসিল করেছে। মানুষ ঠকেই শিখে। গতকাল তুমি যখন ওকে ভদ্রভাবে কথা বলতে বললে তখন ও ভীষণ মনে কষ্ট পেয়েছে। তুমি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কেঁদেছে। আমি কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করতে বলল, "রফিককে অপমান করার জন্য কিছু বলিনি, অথচ সে আমাকে ভুল বুঝল। আমার মনে হয় ও সফিকের কাছে খুব বড় আঘাত পেয়ে এবং আকমলের অমানুষিক চরিত্র দেখে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। তাই ঐদিন সুসাইড করার সংকল্প করেছিল। তুমি যদি সেদিন ওকে মসজিদ থেকে সঙ্গে করে বাসায় না নিয়ে আসতে, তাহলে হয়তো ঐদিন কিছু একটা করে ফেলত।

তোমার কার্য্যকলাপ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ওকে মুগ্ধ করেছে। ওর জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিয়েছে। তাই ও অতীত জীবনের সবকিছু ভুলে গিয়ে তোমাকে ভালোবেসে ও বিশ্বাস করে ফেলেছে। অবশ্য এ ব্যাপারে লিজা আমাকে কিছু বলে নি। তোমার সম্বন্ধে তার কথাবার্তা শুনে আমার তাই মনে হয়েছে। আজ কয়েকদিন থেকে বলছে, নানি, তুমি রফিকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল। ও যদি না যায়, তবে এখানে আকমলের হাতে আমার মৃত্যু হলেও আমি যাব না। তুমি জান কি না জানি না, লিজা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ওর মা আজ দশ বছর হল আয়ারল্যাণ্ডে একজন লোককে বিয়ে করে চলে গেছে। বেঁচে আছে কিনা আজ পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাই নি। লিজাকে এক রকম আমিই মানুষ করছি। ওকে আমি নিজের থেকে বেশি ভালবাসি। ওর নানা মারা যাওয়ার অনেক আগের থেকে সবকিছু লিজার নামে উইল করে দিয়ে গেছে। ওর যদি কিছু হয়, আমি কাকে নিয়ে কার জন্য বাঁচব?

তুমি শিক্ষিত হয়েও এখানে ভালো চাকরি পাচ্ছ না। তাই বলছিলাম, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে আমাদের ব্যবসার হাল ধর, তাহলে আমি ও লিজা তোমার ঋণ কিছুটা শোধ করতে পারতাম। তুমি যেভাবে নিজের ভালো মন্দের দিকে চিন্তা না করে আমাদের সাহায্যার্থে ছুটাছুটি করছ, সে কথা আমরা কোনোদিন ভুলতে পারব না। তোমার যাওয়ার ব্যাপারে যা কিছু দরকার, আমি সে সব ব্যবস্থা করব। তুমি হয়তো ভাবতে পার, আমার ডিভোর্স করা নাতনিকে তোমার কাঁধে চাপাবার জন্য এসব কথা বলছি। এটা যদি ভাব, তবে ভুল করবে ভাই। কারণ লিজাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি তোমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারি। আমি জানি কোনো পুরুষই চায় না, প্রথম যৌবনে কোনো পরিত্যক্তা মেয়েকে বিয়ে করতে। আর বিয়ের ব্যাপারে লিজাও কোনো দিন তোমাকে মুখ ফুটে হয়তো বলবে না। তোমার কাছে আমার শুধু অনুরোধ থাকবে, তুমি লিজাকে বন্ধু মনে করে সহজভাবে তার সঙ্গে মেলামেশা করবে। তাহলে সে আগের জীবনে ফিরে যেতে পারবে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যদি লিজা অন্য কাউকে বিয়েও করে, তবে তোমার কোনো অসুবিধা যাতে না হয় সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। আমার নিজস্ব যা কিছু আছে তা সব তোমাকে দিয়ে যাব। যাতে করে লিজা বা তার স্বামী ভবিষ্যতে তোমাকে পথে বসাতে না পারে।

রফিক হাত তুলে নানিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, বেয়াদবি মাফ করবেন। আপনি খুব বেশি লোভ দেখাচ্ছেন। যদি ভেবে থাকেন লোভ দেখিয়ে কাজ হাসিল করবেন, তাহলে সে

ধারণা আপনার ভুল। কারণ ধনসম্পত্তির চেয়ে জ্ঞান অর্জনের উপর আমার ঝোঁক বেশি। আমার জীবনের 'এইম' জ্ঞান অর্জন করা। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ বলেন, যাকে আমি প্রচুর ঐশ্চর্য্য দান করেছি, সে ভাগ্যবান নয়, বরং সেই ভাগ্যবান, যাকে আমি জ্ঞান দান করেছি। তাই আমি তাঁর বাণী স্মরণ করে ঐশ্বর্য্যের চেয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রত্যাশী বেশি।

নানি বললেন, সে তো খুব ভালো কথা। ধনের চেয়ে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তুমি আমাদের অফিসের কাজের পর প্রচুর সময় পাবে। তোমার পড়াশোনার অসুবিধে হবে না। তোমাকে তো আর সে রকম কাজ করতে হবে না।

রফিক বলল, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আমার মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়। এই সামান্য পরিচয়ে আমাকে এতটা বিশ্বাস করছেন কেমন করে, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না? তাছাড়া আমি আপনাদের সব কথা ও উদ্দেশ্য বুঝলাম। কিন্তু আমারও তো কিছু বলার থাকতে পারে। আমাকে কয়েকদিন সময় দিন। আমি ভেবে চিন্তে আমার মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে দেখব। আপনারা যে গুরুদায়িত্ব আমাকে দিতে চাচ্ছেন, তার উপযুক্ততা আমার আছে কি না সেটাও ভেবে দেখতে হবে।

অফকোর্স, তুমি সবকিছু ভেবে দেখবে বৈ কি। তোমার মায়ের সঙ্গেও আলোচনা কর। তবে আমার যতদূর বিশ্বাস, তুমি সবকিছু সামলাতে পারবে।

সেখানেই তো বেশি চিন্তা। যারা আমাকে ভালভাবে না জেনে, না শুনে, বিশ্বাস করে এত বড় দায়িত্ব দিতে চাইছেন, আমি তা বহন করতে পারব কি না গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার।

লিজা ড্রেস চেঞ্জ করে এসে দরজার বাইরে পর্দার আড়াল থেকে এতক্ষণ তাদের সব কথা শুনছিল, আয়া কফির ট্রে নিয়ে এলে তার কাছ থেকে সেটা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

রফিক সেদিকে তাকাতেই চোখে চোখ পড়ে গেল।

লিজা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। আজ লিজা সাদা সিফনের লাল পেড়ে শাড়ী এবং ঐ কাপড়েরই ব্লাউজ পরেছে।

এর আগে রফিক অনেক শাড়ী পরা মেমসাহেব দেখেছে। তাদেরকে দেখতে বেঢপ বলে তার মনে হয়েছে। কিন্তু লিজার শারীরিক গঠন খুব সুন্দর। শাড়িতে তাকে অপূর্ব লাগছে। সে সবকিছু ভুলে লিজার দিকে চেয়ে রইল। তখন তার বন্ধু আবিদের কথা মনে পড়ল, কি করে যে তুই অমন সুন্দরী মেম সাহবের অফার করা হ্যাণ্ডসেক ডিনাই করলি, ভেবে পাচ্ছি না। সে দিন সে উত্তর দিয়েছিল, তা বলে বেগানা মেয়ের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করব। কিন্তু আজ যদি লিজা হ্যাণ্ডসেক করার জন্য হাত বাড়ায়, তাহলে হয়তো ডিনাই করতে পারবে না।

রফিককে একদৃষ্টে লিজার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে নানি অনেক কিছু বুঝে নিলেন। কারণ যুবক যুবতীর ঐ চাহনির অভিজ্ঞতা তার আছে। বললেন, তোমরা দুজনে কপি খেতে খেতে গল্প কর, আমি আসছি। তারপর ভিতরে চলে গেলেন।

লিজা রফিকের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি রাখতে পারল না। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে কফি বানিয়ে তার দিকে কাপটা বাড়িয়ে বলল, নিন।

রফিক লিজার গলার শব্দে সম্বিত ফিরে পেয়ে কাপটা হাতে নিয়ে বলল, আপনি খাবেন না।

লিজা মাথা নেড়ে নিজের জন্য এক কাপ বানাল। কিন্তু না খেয়ে রফিকের দিকে ভর্যাত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

তারা যেন আজ দু'জন দু'জনের মনের খবর পেয়ে উভয়ে উভয়কে নতুন রূপে উপলব্ধি করছে।

রফিক খেয়ে নিয়ে কাপটা টেবিলের উপর রাখতে গেলে লিজা সেটা হাতে নিয়ে রাখল।

রফিক বলল, কই আপনি খাচ্ছেন না? ঠাণ্ডা হয়ে হেল তো?

লিজা দু' একবার চুমুক দিয়ে কাপটা রেখে দিল। তারপর ভীত কপোতির ন্যায় তার দিকে চেয়ে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

রফিক তার ভীতি ভাবটা বুঝতে পেরে বলল, অত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি বাঘ না ভালুক? কি জিজ্ঞেস করবেন করুন।

তবু লিজার ভয় কাটল না। ভয়ার্তস্বরে বলল, আপনি আমাকে তুমি করে বলছেন না কেন? যখন আপনি করে কথা বলেন তখন আমার খুব ভয় করে।

কেন, ভয় করে কেন? আমি কি কখনো অভদ্র ব্যবহার আপনার সঙ্গে করেছি?

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে লিজা বলল, প্লীজ ও রকম বলবেন না। বরং আমিই আপনার সঙ্গে অনেক অভদ্রতা করে ফেলেছি। সে জন্য মাফ চাইছি।

রফিক মৃদু হেসে বলল, সত্যি তোমার নানির কথাই ঠিক। তুমি বড় সরল। ভাবছি কি করে ইউনিভর্সিটিতে পড়াশুনা করেছ?

রফিককে তুমি করে বলতে শুনে লিজার ভয় কেটে গেল। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে হেসে উঠে বলল, তোমার, মানে আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ঠিক আছে লণ্ডনে গিয়ে আমার সার্টিফিকেট দেখাব।

রফিক হেসে উঠে বলল, আর আপনি করে বলতে হবে না। মন যা চায় না, তা কি আর জোর করে করা যায়?

এমন সময় নানি এসে রফিকের শেষের কথা শুনতে পেয়ে বললেন, ঠিক বলেছ ভাই। মন যা চায় না, তাকে যদি কেউ জোর করে চাপিয়ে দেয়, তাহলে সে সুযোগ খুঁজতে থাকে কি করে সেই আপদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। তারপর সোফায় বসে বললেন, তোমার সম্পূর্ণ পরিচয় এখন পর্যন্ত জানতে পারলাম না।

আমার নাম রফিকুল বারি, পিতা মরহুম কেরামত আলী, বাড়ী ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী গ্রামে। বর্তমানে সেগুন বাগিচায় বাসা ভাড়া করে আছি। ইংলিশে অনার্স করেছি। এখন ঢাকা নিউ মার্কেটে একটা ষ্টেশনারী দোকানে কাজ করছি। তারপর একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, এই বায়োডাটাতে চাকরি পাব তো?

ওর কথায় সকলে হেসে উঠল।

লিজা জিজ্ঞেস করল, মরহুম মানে কি?

রফিক বলল, মৃত।

লিজা আবার জিজ্ঞেস করল, ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে জানতে হলে আগে কি বই পড়া দরকার?

প্রথমে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনী, তারপর কুরআনের ব্যাখ্যা পড়তে হবে। আর সেই সঙ্গে হাদিস ও সাহাবাদের জীবন চরিতও পড়তে হবে।

হাদিস কাকে বলে?

হাদিস হল, হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বাণী।

নানি বললেন, লিজা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনী কিনবে বলছিল। আমারও পড়ার খুব ইচ্ছা।

রফিক বলল, সে তো খুব ভালো কথা।

লিজা বলল, চল, এখন মার্কেটে গিয়ে কিনে আনি।

লিজাকে রফিক বলল, চল তা হলে।

নানি বলল, তুই তৈরি হয়ে আয়। আমি ততক্ষণ ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিই।

লিজা বেরিয়ে যেতে নানি বললেন, তুমি ভাই কিছু মাইণ্ড করো না। তুমি আজই চাকরিতে রিজাইন দিয়ে দাও। তোমাকে আজ থেকেই আমি এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিলাম। তা না হলে তুমি তো আবার টাকা নেবে না। টাকা না হলে তোমার চলবে কেমন করে?

আমরা তোমাকে যেমন বিশ্বাস করেছি, আশা করি, তুমিও আমাদের বিশ্বাস করবে। ভালো কথা, তোমার কে কে আছে বললে না যে?

আমার কোনো ভাই বোন নেই। শুধু মা আছেন। তিনি আমার সঙ্গে ঢাকাতেই থাকেন।

তাহলে তো ভালই হলো। তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে।

এমন সময় লিজা তৈরি হয়ে এসে নানিকে বলল, আপনি যাবেন না?

না, তোমারা যাও। এই কথা বলে নানি ভিতরে চলে গেলেন।

রফিক লিজার সঙ্গে নিচে এসে ড্রাইভ আসনে বসল। আকমলের বাসা থেকে এখানে চলে আসার পর লিজা এই গাড়ীটা ভাড়া নিয়েছে।

লিজাকে রফিকের পাশে বসতে দেখে রবার্ট পিছনের সীটে উঠতে গেলে লিজা তাকে হাতের ইশারায় গাড়িতে উঠতে নিষেধ করল।

রবার্ট অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

রফিক ষ্টেডিয়ামের দোতলার একটি লাইব্রেরীতে গিয়ে লিজাকে জিজ্ঞেস করল, বই ইংলিশ মিডিয়ামে না বাংলা মিডিয়ামে কিনবে?

লিজা বলল, সব বই ইংলিশ মিডিয়ামে, শুধু হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনী বাংলা মিডিয়ামেও এক কপি কিনব।

বইপত্র কেনার পর রফিককে গাড়ির দিকে যেতে দেখে লিজা বলল, বায়তুল মোকাররামটা ঘুরিয়ে দেখাবে? এটাতো আসলে একটা মসজিদ তাই না?

রফিক বলল, হ্যাঁ, চল দেখাচ্ছি। সে তাকে বায়তুল মোকাররাম ঘুরে ঘুরে দেখাবার সময় বলল, এখানে মেয়েরাও নামায পড়ে।

লিজা অবাক হয়ে বলল, এখানে নারী-পুরুষ তাহলে একসঙ্গে নামায পড়েন। কই একদিনও তো দেখলাম না, কোনো মেয়েকে এর ভিতরে যেতে আসতে।

রফিক বলল, মেয়েদেব নামায পড়ার জন্য ও যাতায়াতের জন্য সেপারেট ব্যবস্থা আছে। চল এবার ফেরা যাক।

লিজা বলল, তুমি আমাকে বড় এড়িয়ে চলতে চাও। রফিককে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইতে দেখে ভীতস্বরে বলল, তুমি ওভাবে আমার দিকে চাও কেন? আমি তোমার ঐ দৃষ্টি সহ্য করতে পারি না, বড় ভয় করে।

রফিক দৃষ্টিটা সংযত করে নরম সুরে বলল, তুমি আমার উপর দুটো দোষ চাপিয়েছ। তার কারণটা জানতে পারি?

লিজা বলল, তোমার উপর দোষ চাপিয়েছি কি না জানি না। আমার যা মনে হয়েছে বলেছি। সেগুলোর উত্তর যদি জানতে চাও, তাহলে প্রথমে একটা রেষ্টুরেন্টে চল, আগে গলা ভিজিয়ে নিই। তারপর তুমি যদি অভয় দাও, তাহলে কারণগুলো বলতে পারি।

রফিম মৃদু হেসে বলল, চল বসা যাক। তোমাকে অভয় দিলাম। কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না, তুমি সব ব্যাপারে আমাকে ভয় পাও কেন? তার কারণও বলতে হবে।

তারা একটা ভালো রেষ্টুরেন্টে ঢুকে কোণের দিকের টেবিলে মুখোমুখি বসল।

বেয়ারা এলে রফিক বলল, কি খাবে অর্ডার দাও।

বারে! আমি একা খাব বলে বুঝি এলাম।

কিন্তু আমি তো এখন খাব না।

কেন খাবে না? এত কম খেলে শরীরে শক্তি হবে কোথা থেকে?

আমাকে দেখে কি খুব দুর্বল মনে হয়?

রফিকের কথা শুনে লিজার সেই রাতের গাড়ি ঠেলে দেবার কথা মনে পড়ল। বলল, না তা মনে হয় না। তবে শরীর ঠিক রাখার জন্য পরিমিত খাদ্যের প্রয়োজন।

রফিক বেয়ারকে হাল্কা নাস্তা ও কফির অর্ডার দিয়ে বলল, ধনী লোকের ছেলে-মেয়েরা

সব সময় মাছ, মাংস, দুধ, ঘী এবং নানা রকম ফলমূল খেয়েও অনেকে দুর্বল ও রোগা থাকে। তাদের কত রকম অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে। আর গরিব দীন মজুরের ছেলে-মেয়েরা দুধ, ঘী, মাছ, মাংস তো দূরের কথা, দুবেলা পেট ভরে খেতেও পায় না। তবুও তারা স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ হয়। আর তাদের অসুখ-বিসুখ ধনীদের তুলনায় অনেক কম। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও অনেক দেখা যায়।

এমন সময় বেয়ারা নাস্তা ও কফি দিয়ে গেল। নাস্তা খেয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে লিজা বলল, আমার প্রায় মনে হয়, তুমি আমাকে ঘৃণা কর। আমাদের জন্য যা কিছু করছ তা শুধু বিপন্নাকে সাহায্য করার জন্য। যাকে আমরা মানবতা বলি। নচেৎ আমার সঙ্গে বেশিক্ষণ মেলামেশা করতে চাও না কেন? সব সময় অজুহাত দেখিয়ে দূরে সরে থাক। আর মাঝে মাঝে এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাও, যা দেখে ভয়ে আমার হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায়। তখন আমার ভীষণ কান্না পায়। কেন তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর বলবে?

রফিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেসে ফেলে বলল, তুমি আমার উপর দোষ চাপিয়েছিলে। তার কারণ জানতে গিয়ে আমি আরও দোষী হয়ে গেলাম এবং দোষী কেন হলাম, সে প্রশ্নের সম্মুখীনও হলাম। এবার তোমাকে বুদ্ধিমতী না বলে পারছি না ; তখন বাসায় বোকা মনে করেছিলাম। এখন দেখছি আমি নিজেই বোকা। তবু তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি।

তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলব, তোমাকে আমি কখনও ঘৃণা করি না। কিছুটা এড়িয়ে চললেও অজুহাত দেখিয়ে দূরে সরেও যাই না। তোমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে, "লাভ এ্যাট ফার্স্ট সাইট।" কথাটা তোমাদের দেশে প্রযোজ্য। কারণ ফার্স্ট সাইটে যেমন লাভ হয়, তেমনি সামান্য মনের গরমিল হলে ছাড়াছাড়ি হতেও দেরি হয় না। সেখানে সেটাকে কেউ খারাপও মনে করে না।

আমাদের দেশের ছেলেরা তোমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা নিতে গিয়ে ডিগ্রীর সঙ্গে এটাও নিয়ে আসে। লণ্ডনে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তবে সেখান থেকে সেই ভাবধারা নিয়ে এসে যারা এদেশে আলাদা সমাজ গড়তে চেষ্টা করছে তাদেরকে দেখেছি। অনেক ছেলের যেমন চার পাঁচটা প্রেমিক প্রেমিকা আছে, তেমনি অনেক মেয়েরও চার পাঁচটা প্রেমিক আছে। শেষমেষ তাঁদের মধ্য থেকে বেছে একজনকে বিয়েও করল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রেমে ভাটা পড়ে। এবং শেষ পর্যন্ত ডিভোর্সের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। অবশ্য সব ক্ষেত্রে যে এরকম হয়, তা নয়। তবে তাদের সংখ্যা কম। আবার অনেক প্রেমিকা বিয়ে করে সুখে আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে শান্তি আছে কি না সন্দেহ।

লিজা বলল, সুখ আর শান্তি কি দুটো আলাদা জিনিস?

অফকোর্স, সুখ হল বাহ্যিক ও দৈহিক ব্যাপার। আর শান্তি হল মানষিক। অনেকে দুটোকে এক মনে করে। তারা বলে সুখ ও শান্তি একে অন্যের সাথে ওৎপ্রতভাবে জড়িত। সুখ না হলে শান্তি যেমন হয় না, তেমনি শান্তি না হলে সুখও হয় না। আমি তাদের মতবাদ মানি না। সুখ হল বাহ্যিক জীবনের আয়েশ আরাম, আর শান্তি হল মনের খোরাক। মানুষ চেষ্টা ও প্রিশ্রম করে সংসারে সুখ আনতে পারে। কিন্তু শান্তি আনতে পারে না। শান্তি পেতে হলে তাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ভোগের মধ্যে সুখ থাকলেও শান্তি নেই। প্রকৃত শান্তি জ্ঞানের মধ্যে। আর জ্ঞানের ফল হল তার বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ যে জ্ঞান অর্জন করবে, সেই জ্ঞান অনুযায়ী যদি নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারে এবং নিজের পরিবারের, সমাজের, তথা দেশ ও দশের মধ্যে সেই জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়ে তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে পারে, তবে সে যে শান্তি পাবে, তা কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না।

লিজা বলল, তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

রফিক বলল, ধর, একজন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক আমাদের কাছে খাবার চাইল, আমরা তখন হয়তো খেতে বসেছি। তখন আমরা বিরক্ত হয়ে তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব। নচেৎ কেউ হয়তো দয়া পরাবশ হয়ে একমুঠ চাল অথবা কয়েকটা পয়সা দিয়ে বিদায় করে দেব। কিংবা কেউ হয়তো আরও একধাপ দয়া দেখাতে গিয়ে বলব, একটু বস বাবু, খাওয়ার পর কিছু বাঁচলে পাবে। হয়তো কিছু উদ্বৃত্ত হল আর ভিক্ষুকটিকে দিল।

কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কেউ নিজে অভুক্ত থেকে ভিক্ষুকটিকে নিজের খাবার তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াতো, তাহলে সে যে তার মনের মধ্যে অনাবিল শান্তি পেত, তা সে ছাড়া অন্য কেউ অনুভব করতে পারবে না। বুঝতে পারছ, আসলে শান্তি হল অন্তরের ব্যাপার। আর একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা ক্লিয়ার বুঝতে পারবে।

একজন দিনমজুর সারাদিন পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় চাল, ডাল কিনে এনে স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে খেয়ে তার পর্ণ কুটীরে নির্ভাবনায় শান্তিতে নিদ্রা যায়। অপর পক্ষে ধনীরা খেয়ে দেয়ে ঘুমোবার সময় তাদের ধনরাশী আরও কি করে বাড়বে সেই চিন্তায় এবং চোর ডাকাতের ভয়ে অনিদ্রায় রাত কাটায়।

গরিব লোক যখন স্ত্রীর জন্য অর্ডিনারী কাপড় কিনে আনে তখন স্ত্রী খুশিতে গদগদ হয়ে স্বামীকে কদমবুসি করে ; সেই সময় স্বামীর মন শান্তিতে ভরে যায়।

আর ধনীরা যত দামী কাপড় কিনে দিক না কেন, স্ত্রীদের মুখে হাসি তো দূরের কথা, কাপড়ের নানারকম দোষ বের করে স্বামীদের সঙ্গে কলহ করে। অথচ স্ত্রীরা একবার ভেবেও দেখল না, স্বামীরা কখন তাদের স্ত্রীদের খারাপ কিছু দিতে চায় না। তখন ধনীদের মনের অবস্থা কি হয় আমি আর বললাম না। আমি অনেক ধনী দম্পতিদের সম্বন্ধে জানি, তাদের দাম্পত্য জীবন কত বিষময়।

লিজা বলে উঠল, তুমি তা হলে ধনীদের ঘৃণা কর?

মোটেই না। ধনীদের ঘৃণা করব কেন? ধনীরা না থাকলে গরিবদের চলবে না। আবার গরিবরা না থাকলে ধনীদেরও চলবে না। তাই আল্লাহপাক কুরআনে বলেছেন,

"মানুষের কল্যাণের জন্য আমি ধনী দরিদ্র করে তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি।'

সৃষ্টিকর্তা যখন এই কথা বলেছেন তখন আমি মুসলমান হয়ে ধনীদেরকে ঘৃণা করতে পারি না। তুমি হয়তো মনে করেছ, ধনীর নাতনি বলে আমি তোমাকে ঘৃণা করি। কিন্তু তা ঠিক নয়। বরং আমি তোমাকে বলে ..... চুপ করে গেল।

লিজা বলল, কি হল চুপ করে গেলে কেন? প্লীজ বল না।

রফিক কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি তোমাকে নিজের অজান্তে ভালবেসে ফেলেছি। কিন্তু আল্লাহ আমাকে ধৈয্য ধরার জ্ঞান ও ক্ষমতা দান করেছেন। তাই নিজেকে সংযত রেখে আমার আশাকে দুরাশা ভেবে তোমাকে কিছুটা এড়িয়ে চলি। আর মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তোমার অন্তরের খবর জানার চেষ্টা করি। মনিষিরা বলেছেন, "মানুষের মুখটা তার অন্তরের আয়না"। মানুষের অন্তরে যা কিছু ঘটে মুখের চেহারায় তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। তা ছাড়া তোমার মুখের দিকে তাকালেই আমার বাল্যসখি রোকেয়ার চেহারা দেখতে পাই।

লিজা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, সে এখন কোথায়?

রফিক আকাশের দিকে শাহদাৎ আঙ্গুল তুলে বলল, আল্লাহ তাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তোমার নানির কাছে যা শুনলাম এবং তোমাকে যতটুকু জেনেছি, তাতে আমার হৃদয় শান্তিতে ভরে গেছে। তবু ভীষণ ভয় হয়। এত শান্তি কি আমার ভাগ্যে সইবে? কারণ ছোটবেলা থেকে আত্মীয়-স্বজনের কাছে শুনে আসছি, আমার ভাগ্য নাকি খারাপ। আল্লাহকেই মালুম তিনি আমার ভাগ্যে কি লিখেছেন।

রফিক তাকে ভালবাসে এই কথা শুনে লিজা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। আনন্দের অতিশয্যে কিছু বলতে পারল না। শুধু বড় বড় চোখ মেলে রফিকের মুখের দিকে

চেয়ে রইল। আর তার হরিনীর মতো পটলচেরা চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে রক্তিম গোলাপী আপেলের মতো দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রফিক লিজার ঐ অবস্থা দেখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ খানিকটা দূরে একটা লোকের দিকে নজর পড়তে তার মনে হল, লোকটা তাদের কথাবার্তা আড়িপেতে শুনছে। লোকটিকে ভালো করে দেখে মনে পড়ল, বৃটিশ হাইকমিশন অফিস থেকে বেরোবার সময় গেটের উল্টোদিকে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে লিজার কথাও মনে পড়ল, আকমলের লোক সব সময় তার উপর নজর রাখে।

লোকটি রফিককে তার দিকে চাইতে দেখে তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গেল। লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার পর লিজার দিকে চেয়ে রফিক বলল, তুমি কাঁদছো কেন? আমার কথা শুনে যদি তুমি মনে কষ্ট পেয়ে থাক, তবে মাফ চাইছি। মনের আবেগে হয়তো অন্যায় কিছু বলে ফেলেছি।

লিজা চোখ মুখ মুছে আবেগ জড়িত সুরে বলল, না রফিক না, তোমার কোনো অন্যায় হয়নি। বরং আজ তোমার মনের খবর জানতে পেরে আনন্দ ধরে রাখতে পারছি না।

রফিক কয়েক সেকেণ্ড তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, চল এবার ফেরা যাক। অনেক দেরি করে ফেললাম। তারপর বিলের টাকা দিয়ে তারা গাড়িতে উঠল।

জাফর রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে লিজার গাড়ি খুলে পিছনের সীটে আত্মগোপন করেছিল। গাড়িতে উঠার সময় রফিক ও লিজা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় পিছনের সীটের দিকে কেউ লক্ষ্য করেনি। তাই তারা জাফরকে দেখেনি।

গাড়িটি রাস্তায় উঠে কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ রফিক কানের গোড়ায় ঠাণ্ডা লোহার নল অনুভব করল। ঘাড় ঘোরাতে যেতে জাফর বলে উঠল উহুঁ, একটুও নড়বেন না। আমার নির্দেশমত গাড়ি চালান। আর ম্যাডাম আপনিও চেচাঁমেচী করবেন না। করলে এ ব্যাচারা মারা পড়বে। রফিক ঘটনাটা বুঝতে পেরে জাফরের নির্দেশ মত লালবাগের একটা পুরান বাড়ির গেটে এসে গাড়ি থামাল। কয়েক সেকেণ্ড পর আপনা থেকেই গেট খুলে যেতে রফিক গাড়ি ভিতরে ঢুকিয়ে জাফরের কথামত পার্ক করল।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে তিন চার জন লোক এসে চার পাশে দাঁড়াল। জাফর পিস্তল পকেটে রেখে বলল, আপনারা নেমে পড় ন।

লিজা ভয়ে ভয়ে নামল। রফিক কিন্তু ভয় পেল না। সেও নেমে এল।

তাদেরকে নিয়ে সকলে একটা হল ঘরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে জানালার দিকে একটা মাত্র চেয়ার ও টেবিল। বাড়িটা বাইরে থেকে পুরান দেখতে হলে কি হবে ভিতরে একদম নুতনের মতো। তারা রফিককে সবাই মিলে চেয়ারে বসিয়ে পিছমোড়া করে রশি দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলল।

রফিক চুপ করে রয়েছে। সে তাদের কোনো কাজে বাধা দিল না। ইচ্ছা করলে সে তাদের সঙ্গে লড়াই করে লিজাকে নিয়ে চলে আসতে পারত; কিন্তু তা না করে চুপ করে রইল। কারণ আকমলকে কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্য সে প্রতিজ্ঞা করেছে।

তাদেরকে বাঁধতে বলে জাফর বেরিয়ে গেছে। রফিককে বেঁধে রেখে তাদের একজন পাশের ঘর থেকে একটা চেয়ার এনে লিজাকে তাতে বসতে বলল।

লিজা না বসে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, আমাদেরকে এভাবে এখানে নিয়ে এলেন কেন? কে আপনারা?

তাদের মধ্যে একজন বলল, একটু অপেক্ষা করুণ সবকিছু জানতে পারবেন।

লিজা রফিকের দিকে তাকিয়ে অবাক হল। যেন কিছুই হয়নি এমনি তার ভাব।

প্রায় আধঘন্টা পর জাফরের সঙ্গে আকমল ঘরে ঢুকে লিজার দিকে চেয়ে বলল, আরে লিজা, তুমি এখানে কি করে এলে?

লিজা বলল, দেখুন না মিষ্টার আকমল, আমি ও রফিক গাড়িতে করে মার্কেট থেকে বাসায় ফিরছিলাম, তারপর জাফরকে দেখিয়ে বলল, ঐ লোকটা পিস্তল দেখিয়ে আমাদেরকে এখানে নিয়ে এল। আপনি রফিকের বাঁধন খুলে দিতে বলুন।

পকেট থেকে একটা দলিল বের করে আকমল বলল, নিশ্চয় খুলে দিতে বলব। খবর পেয়ে সেইজন্যই তো এলাম। তবে তার আগে তুমি এটাতে কয়েক জায়গায় সিগনেচার দিয়ে দাও।

কেন? এটা কিসের কাগজ দেখি বলে তার হাত থেকে নিয়ে পড়তে লাগল-

আমি, লিজা। পিতা.....অধিবাসী, বাংলাদেশে বেড়াতে এসে লণ্ডনের সহপাঠী মিঃ আকমলকে, পিতা..... ঢাকা নিবাসী, প্ররোচনা বা কারো ভীতি প্রদর্শন ছাড়া স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে বিয়ে করার জন্য সর্বান্ত করণে রাজি হয়ে দস্তখত দিলাম।

এই পর্যন্ত পড়ে লিজা রাগে চোখ মুখ লাল করে বলল, অসম্ভব, এ হতে পারে না। সিগনেচার আমি দেব না। আপনি এত বড় পাষণ্ড, এত বড় মিথ্যাবাদী, এত নীচ, তা আমি ভাবতে পারছি না। এটা ছাড়া আপনি যত টাকা চান দেব, আপনি শুধু রফিককে মুক্ত করে আমাদেরকে এখান থেকে যেতে দিন।

আকমল বলল, মুক্ত করতে তো এসেছিলাম, তুমিই তো তাকে মুক্তি দিতে চাইছো না। দেখা যাক রফিক সাহেব কি বলেন। তারপর রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, কি হে ছোকরা, তোমাকে সেদিন যে কথা বলেছিলাম, মনে রাখলে আজ এমন পরিনতি হত না। অবশ্য এখনও সময় আছে। তুমি লিজাকে সিগনেচার দিতে বললে, ও দেবে। ওর সিগনেচারই তোমার মুক্তিপণ।

রফিক কিছু না বলে চুপ করে রইল।

আমকল রাগের সঙ্গে বলল, চুপ করে আছ কেন? যা বললাম তাই কর। তবু রফিক কথা বলছে না দেখে আকমল তার দুগালে সজোরে কয়েকটা থাপ্পড় মেরে গর্জে উঠল, এই শেষবারের মত বলছি, যদি আমার কথা মতো কাজ না কর, তবে এই বাঁধা অবস্থায় তোমাকে দীর্ঘদিন ফেলে রাখা হবে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তড়পাতে তড়পাতে এক সময় তোমার কণ্ঠ রোধ হয়ে যাবে। শত চিৎকার করলেও কেউ তোমাকে উদ্ধার করতে আসবে না। এমন কি তোমার সেই কথিত আল্লাহও না। আমি তোমাকে তিন মিনিট সময় দিলাম। তারপর আমরা লিজাকে নিয়ে চলে যাব। ভেবে দেখ, শুধু মুখের কথার জন্য তুমি দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাচ্ছ। তুমি তোমার মায়ের একমাত্র সন্তান। তুমি মারা গেলে সে দুঃখিনীকে কে দেখবে?

তারপর ঘড়ির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, তিন মিনিট হয়ে গেছে। আমি কখনও আমার কথার বরখেলাফ করি না। এস তোমরা সকলে চলে এস। তারপর লিজার হাত ধরে বলল, চল লিজা, আমরা এই মৃত্যুপুরী থেকে বিদায় নিই।

রফিকের গালে আকমল যখন থাপ্পড় মারছিল তখন লিজার চোখ থেকে গলগল করে পানি বেরিয়ে পড়ছিল। কিন্তু লিজা খুব আশ্চর্য্য হয়ে দেখল, রফিকের মুখের কোনো ভাবান্তর নেই।

আকমল লিজার হাত ধরতে লিজা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করে না বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

আকমল তাকে জোর করে নিয়ে যেতে লাগল।

এতক্ষণ রফিক সুবোধ বালকের মতো চুপ করে পরিবেশটা লক্ষ্য করে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এবার সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বলে উঠল, দাঁড়ান।

ওরা সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রফিককে ওরা একজন ভদ্র ঘরের সাধারণ ছেলে মনে করে তেমন কায়দা করে বাঁধেনি। যখন আকমল লিজার সঙ্গে কথা বলছিল তখন সে নিজের হাতের পিছনের বাঁধন খুলে ফেলেছে।

সবাই ঘুরে দাঁড়াতে রফিক দৃঢ়স্বরে বলল, লিজা, কাগজে সিগনেচার দিয়ে দাও।

লিজা বলল, আমাকে মেরে ফেললেও আমি সিগনেচার করব না। তুমি কিছু ভেব না রফিক। আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে নিশ্চয় তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করবই করব।

লিজা থেমে যেতে রফিক তীক্ষ্ণস্বরে আবার সিগনেচার করতে বলল।

এবার লিজা একবার রফিকের চোখের দিকে চেয়ে সিগনেচার করতে রাজি হল।

আকমল হাসিমুখে দলিল ও কলম তাকে দিল।

ওরা সবাই যখন লিজার সিগনেচার নিয়ে ব্যস্ত। সেই সুযোগে রফিক নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিয়ে সেখান থেকে জাম্প করে উড়ে এসে ওদের একজনের ঘাড়ের উপর পড়ল। সেতো লম্বা হয়ে পড়ে গিয়ে বাবারে বলে পড়েই রইল। রফিক আর একজনকে ধরে টাল সামলে নিয়ে তার কানের গোড়ায় আষাঢ়ে ঘুষি বসিয়ে দিতে সে কোনো শব্দ না করে জ্ঞান হারাল।

জাফর তাড়াতাড়ি পিস্তল বের করে রফিকের দিকে তাক করল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রফিক তাকে ফায়ার করার সুযোগ দিল না। লাফ দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে তার দুই হাঁটুতে লাথি মারল।

জাফর দুচোখে অন্ধকার দেখে চিত হয়ে পড়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে যেতে জ্ঞান হারাল, আর তার হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে গিয়ে ছিটকে সরে দরজার কাছে চলে গেল। রফিক তারপর অন্য দুজনকে একে একে দুহাত দিয়ে তুলে কয়েকটা আছাড় দিয়ে মেঝেয় ফেলে দিল। এগুলো করতে রফিকের চল্লিশ সেকেণ্ড লাগল।

ঘটনার আকস্মিকতায় আকমল ভেবাচেকা খেয়ে গেল। রফিকের কাজ যেন তার কাছে ভেলকিবাজী বলে মন হল। যখন সে বাস্তব ঘটনা বলে মনে করল এবং রফিকের সঙ্গে লড়াই-এর প্রস্তুতি নিল তখন লেট হয়ে গেছে। ততক্ষণে রফিক তার জামার কলার ধরে তাকে শূন্যে তুলে মেঝেতে আছাড় দিল।

আকমল বেশ শক্তিশালী এবং সে একজন ফাইটারও। তাড়াতাড়ি উঠে রফিককে আক্রমণ করল। রফিক তার আক্রমণ ব্যর্থ করতে গিয়ে অন্য জনের শরীরে পা লেগে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। এই সুযোগে আকমল ও তার একসাথী তার উপর চেপে বসল। রফিক লোকটার চোখে একটা ঘুষি মারতে লোকটা যন্ত্রণায় কুঁচকে গেলে তার শরীরে ঢিল পড়ল। রফিক সেই সুযোগে তার গলার নীচে একটা পা ঠেকিয়ে দূরে ফেলে দিল। তারপর আকমলের মাথাটা দুহাতে ধরে স্প্রীং-এর মত লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার তাকে শূন্যে তুলে দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে দিল। দেয়ালে আকমলের মাথা বাড়ি খেয়ে ফেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। তার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। মাথা তখন তার বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। রফিক ছুটে গিয়ে জাফরের পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে আকমলের দিকে তাক করে বলল, কি আকমল সাহেব, দেখলেন তো আমার সেই কথিত আল্লাহ কেমন করে আমাকে বাঁচালেন। মনে রাখবেন, রাখে আল্লাহ মারে ক? তিনি সব সময় সত্যের পথের পথিককে সাহায্য করে থাকেন। এখন আপনি বলুন, কে আপনাদেরকে রক্ষা করবে? ইচ্ছা করলে আপনাদের সবাইকে এক এক করে গুলী করে হত্যা করতে পারি; কিন্তু তা করবো না। কারণ যিনি জীবন দিয়েছেন, একমাত্র তিনিই মারতে পারেন। কেউ তার কাজে হস্তক্ষেপ করলে তিনি তা সহ্য করেন না। তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য আজ আপনাদের ছেড়ে দিলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে আমার পিছনে আর লাগবেন না। আপনারা যে রকম নরপশু সেজন্য কিছু শাস্তি পাওয়া উচিত বলে প্রত্যেকের বাঁম পায়ে একটা করে গুলী করল। তারা যন্ত্রণায় মেঝেয় পড়ে ছটপট করতে লাগল।

রফিক বলল, আমি থানা থেকে পুলিশ পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারা এসে আপনাদের সেবা যত্ন করবে।

তারপর লিজাকে বলল, চল অনেক দেরি হয়ে গেল। ওদিকে নানি ভীষণ চিন্তা করছেন।

তখনও লিজার হাতে আকমলের কাগজ ও কলম। তার কাছে ঘটনাটা স্বপ্ন বলে মনে হল। সে এমন ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, যেন তার জ্ঞান লোপ পেয়েছে।

তাকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রফিক তার হাত থেকে কলমটা নিয়ে ফেলে দিল। আর দলিলটা কুচিকুচি করে ছিড়ে ফেলে দিয়ে লিজার একটা হাত ধরে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল। তারপর লিজাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে ষ্টার্ট দিল।

গাড়ি দ্রুত চলেছে লালবাগ থানার দিকে। লিজার তখন কোনো দিকে খেয়াল নেই, শুধু রফিকের বীরত্বের কথা চিন্তা করছিল। তার ধারণা হল, রফিক একজন অসাধারণ যুবক। তার চরিত্রের কি দৃঢ়তা! ভীষণ বিপদের সময় ধৈর্য্য ধরার কি অপূর্ব ক্ষমতা। সে রফিকের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল। আল্লাহর উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস দেখে তাজ্জব বনে গেল। শেষে তার মনে হল, রফিক নিশ্চয় একজন ভালো ফাইটার। নানান চিন্তার মধ্যে সে ডুবে রইল। রফিক থানায় পৌঁছে কখন গাড়ি পার্ক করল তাও বুঝতে পারল না। তখন সে ভাবছে, আজ যদি রফিক ঐ নরপিশাচের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারত, তাহলে কি হত? সেকথা মনে হতে চমকে উঠল।

এদিকে রফিক গাড়ি থেকে নেমে থানার ভিতরে গিয়ে দারোগা সাহেবের কাছে আকমল ও তার দলবলের সব ঘটনা খুলে বলল।

সব শুনে দারোগা সাহেব কয়েকজন পুলিশ নিয়ে রফিকদেরকেও সঙ্গে আসতে অনুরোধ করলেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আকমলকে চিনতে পেরে বললেন, জানেন রফিক সাহেব, সমাজের প্রতিপত্তিওয়ালা ভালো লোক সেজে ভিতরে ভিতরে ইনি অনেকদিন থেকে স্মাগলিং দলের লীডারগিরী করছিলেন। প্রমাণের অভাবে আমরা সব কিছু জেনেও কিছু করতে পারছিলাম না। এবার বাছাধন শ্রী ঘরে গেলে কত ধানে কত চাল বুঝতে পারবেন। পুলিশদের অর্ডার দিলেন সবাইকে এ্যারেষ্ট করে গাড়িতে তুলতে।

তারপর রফিকের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে বললেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সাহায্য না পেলে এত সহজে এদেরকে আমরা ধরতে পারতাম না। তারপর লিজার দিকে চেয়ে ইংরেজীতে বললেন, আপনি আমাদের দেশের মেহমান। এরা আপনাকে অপদস্ত ও অপমান করার জন্য আমরা দুঃখিত। অবশ্য এর জন্য এরা কঠোর শাস্তি পাবে। আচ্ছা আপনারা এবার আসুন। আমরা এদের সদগতি করে ফিরব।

সেখান থেকে রফিক লিজাকে নিয়ে তাদের বাসায় ফিরল। তাদেরকে দেখে নানি বললেন, তোমাদের ফিরতে এত দেরি হল কেন? তারপর রফিকের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে আতঙ্কিতস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছিলে?

লিজা নানিকে জড়িয়ে ধরে বলল, আজ রফিক না থাকলে কি যে হত, তারপর ফুঁপিয়ে উঠল।

নানি লিজার অবস্থা দেখে রফিককে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে বলতো ভাই। তোমার চেহারা এবং জামা কাপড় দেখে মনে হচ্ছে মারামারি করে এসেছ?

রফিক মৃদু হেসে বলল, আপনার অনুমান ঠিক। রাস্তা থেকে আকমলের লোক পিস্তল ঠেকিয়ে আমাদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের আড্ডা থেকে লড়াই করে বেরিয়ে আসতে হয়েছে, এই আর কি?

নানি বললেন, তোমাকে উনডেড মনে হচ্ছে, বস। লিজাকে বললেন, কান্না থামিয়ে তাড়াতাড়ি ফাষ্ট এডের বাক্সটা নিয়ে আয়।

রফিক বলল, কোনো কিছুর দরকার নেই। আমি তেমন আঘাত পাই নি। আপনি কিছু ভাববেন না।

লিজা ফাষ্ট এডের বাক্স নিয়ে ফিরে এলে নানি তুলোতে ডেটল লাগিয়ে রফিকের আঘাত পাওয়া জায়গাগুলো পরিষ্কার করে দিয়ে বললেন, চল, কোনো ডাক্তারের চেম্বারে যাই।

রফিক বলল, আর কিছু লাগবে না, আমি এখন আসি।

লিজা ছলছল নয়নে বলল, এত তাড়াহুড়ো করছো কেন? কিছুক্ষণ রেষ্ট নাও। তারপর আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে বাসায় যাবে।

লিজার কান্নাভেজা মুখের দিকে চেয়ে না বলতে রফিকের খুব কষ্ট হল। তবু বলল, দুপুরে বাসায় খাব বলে মাকে বলে এসেছিলাম। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। খেয়ে গেলে আরও দেরি হয়ে যাবে। আমি না ফেরা পর্যন্ত মা না খেয়ে থাকবে। মাকে অভুক্ত রেখে

আমি কি করে খাই বল?

মায়ের প্রতি ছেলের সম্মান ও ছেলের প্রতি মায়ের স্নেহের কথা শুনে লিজা ও তার নানি খুব অবাক হল।

নানি বললেন, তাহলে তো তোমাকে জোর করতে পারি না।

লিজা জিজ্ঞেস করল, বাংলাদেশের সব মা ও ছেলের সম্পর্ক কি এই রকম?

রফিক বলল, সবাই না হলেও অনেকে এই রকম আছে। তাছাড়া অন্যজনে কি করছে না করছে দেখব কেন? আমি দেখব আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দঃ) কিভাবে ব্যক্তিগত, সাংসারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন।

লিজা আবার জিজ্ঞেস করল, ইসলামের আইনে আছে বুঝি মায়ের আগে ছেলে অথবা ছেলের আগে মা খেতে পারবে না।

রফিক স্মীত হাস্যে বলল, না তা নেই। তুমি তো কুরআনের ট্রানস্লেট কিনেছ। পড়লে সব জানতে পারবে। তোমার প্রশ্নের উত্তরে কুরআনের একটা আয়াতের (বাক্যের) মানে বলছি।

"আর তোমার পরওয়ারদিগার আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিওনা, এবং তুমি মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও, যদি তোমার সম্মুখে তাঁহাদের একজন কিংবা উভয় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাঁহাদিগকে উহ্ পর্যন্ত বলিও না। আর তাঁহাদিগকে ধমক দিওনা এবং তাঁহাদের সঙ্গে খুব আদবের সহিত কথা বলিও। এবং তাঁহাদের সম্মুখে করুণভাবে বিনয়ের সহিত নত থাকিবে। আর এরূপ দো'য়া করিতে থাকিবে–হে আমার পরওয়ারদিগার, তাঁহাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন–যেইরূপ তাঁহারা আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন শৈশব কালে (১)।"

আল্লাহর রাসূল (দঃ) হাদিসে বর্ণনা করিয়াছেন, "পিতা-মাতার পায়ের তলায় সন্তানের বেহেস্ত।"

এই সব বলতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তুমি যে সমস্ত বই কিনেছ সেগুলো পড়তে থাক। তাহলে তোমার অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। এখন আসি, আল্লাহ হাফেজ বলে যাবার উপক্রম করল।

লিজা বলল, এই শোনো, আল্লাহ হাফেজের মানে বলে দিয়ে যাও।

রফিক বলল, আল্লাহ তোমাদের নিরাপদে রাখুন। তারপর তাদের বাসা থেকে বেরিয়ে এল।

নানি ও লিজা ইসলামের তাৎপর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

রফিক চলে যাওয়ার পর লিজা বলল, জান নানি, রফিককে দেখতে সাদাসিদে মনে হলে কি হবে, অসাধারণ শক্তি তার গায়ে। তাকে আকমলের লোকেরা চেয়ারের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছিল। কি করে যে সকলের অলক্ষ্যে বাঁধন খুলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আকমল ও তার চারজন গুণ্ডা সঙ্গীকে ঘায়েল করে আমাকে নিয়ে এল, নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। মনে হয়, ও একজন ভালো ফাইটার। তারপর সব ঘটনা খুলে বলল।

সব শুনে নানি বললেন, তাই না কি? তাহলে তো আমাকে নিজের চোখে দেখতে হয়। তারপর দুজনে মিলে রবার্টকে ঈশারায় সব কিছু বুঝিয়ে একটা প্লান ঠিক করল।

রফিক বাসায় ফিরে মাকে বলল, তাড়াতাড়ি খেতে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে।

কুলসুম বিবি ছেলেকে ভাত খেতে দিয়ে বললেন, এত বেলা পর্যন্ত কোথায় ছিলি, আজ কদিন অফিস কামাই করছিস, চাকরির ক্ষতি হবে না?

রফিক খেতে খেতে বলল, ভাবছি চাকরিটা ছেড়ে দেব।

কেন? অন্য কোথাও ভালো চাকরি পেয়েছিস নাকি?

(১) সূরা-বনী ইসরাইল, আয়াত-২৩/২৪, পারা-১৫

হ্যাঁ, তুমিও খেয়ে নাও, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কুলসুম বিবি হাঁড়ী বাসন ধুয়ে সব গোছ-গাছ করে হাত মুছে পানের ডাবা নিয়ে রফিকের ঘরে ঢুকলেন।

রফিক চৌকিতে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল। মাকে আসতে দেখে উঠে বসে তার পাশে বসতে বলল।

কুলসুম বিবি বসে পান সাজতে সাজতে বললেন, কি বলবি বলছিলি?

রফিক লিজার নানির সঙ্গে চাকরির ব্যাপারে যা কথা হয়েছিল, তা সব বলে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি বল মা?

আমি আর কি বলব? তুই যদি ভালো মনে করিস করবি।

তবু তোমার একটা নিজস্ব মতামত আছে। তুমি যদি অমত কর অথবা তোমার যদি ঐ কাজ পছন্দ না হয়, তবে আমি ভালো মনে করলেও করব না।

কুলসুম বিবি বললেন, ওরা খৃষ্টান। ওদের লজ্জা সরমের বালাই নেই। ওদের সঙ্গে এক সাথে থাকা কি ঠিক হবে? সব থেকে বড় কথা, ওরা আমাদের ধর্মের দুষমন।

রফিক বলল, মা তুমি ঠিক কথা বলেছ। তবে ওদেরকে আমি যতটা জেনেছি, ওরা অন্যান্য খৃষ্টানদের মত নয়। বরং নানি নাতনি ইসলামের সবকিছু জানার জন্য খুব আগ্রহী। আর সেইজন্য আজ আমাকে দিয়ে কুরআন ও হাদীসের অনেক বই কিনিয়েছে। আমার মন বলছে, ঐ সব যদি পড়ে, তবে ইনশাআল্লাহ ওরা খুব শিগ্রী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলবে। আমিও সব সময় ইসলামের মহত্ত্ব ওদের সামনে তুলে ধরি। তুমি দো'য়া কর মা, আল্লাহ যেন ওদেরকে হেদায়েৎ দান করে আমার মনের আশা পূর্ণ করেন। যদি ওরা আমার প্রচেষ্টায় ইসলাম ধর্ম কবুল করে, তবে সেটাও একটা বড় সওয়াবের কাজ হবে।

কুলসুম বিবি বললেন, আল্লাহ্ তোর মনের বাসনা পূরণ করুক। আচ্ছা, তুই যে বলেছিলি আকমল না কে একজন ঐ মেম সাহেবকে বিয়ে করতে চায়। সে যদি খারাপ লোক হয়, তাহলে তোকে সে কি অত সহজে ছেড়ে দেবে? কোনো বিপদে ফেলে তোর ক্ষতি করতে পারে।

রফিক বলল, আমি যদি সৎপথে থাকি, তবে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন। তিনি সহায় থাকলে শত শত আকমলকে তোমার ছেলে ভয় পায় না। তুমি শুধু দো'য়া কর।

কুলসুম বিবি বললেন, আমি তো সব সময় তোর জন্য দো'য়া করি। তুই খুব সাবধানে চলাফেরা করবি। আমি এখন ও ঘরে যাই, তুই একটু আরাম কর।

সেদিন রফিক আর কোথাও বেরুল না। তার পরেরদিন নাস্তা খেয়ে দোকানে গেল।

দোকানের মালিক জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার রফিক, কদিন কামাই করলে কেন? কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছিল না কি?

রফিক রেজিগনেশান লেটারটা সাহেবকে দিয়ে বলল, আমি একটা বেটার চান্স পেয়েছি। তাই সেই ব্যাপারে ছুটাছুটি করতে হচ্ছে। বেয়াদবি মাফ করবেন।

রফিকের মত কর্মঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ ছেলে পেয়ে দোকানের মালিক খুশি হয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যে অনেক উন্নতি দেখিয়েছে। রেজিগনেশান লেটার পেয়ে তার মন খারাপ হয়ে গেল। তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, এটা তো খুব ভালো খবর। আশা করি, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও। তিনি বেতনের হিসাব করে পাওনা টাকা নিয়ে যেতে বললেন।

রফিক সাহেবের কাজ থেকে বিদায় নিয়ে বন্ধু আবিদের লাইব্রেরীতে গেল। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর রফিক এখানে চাকরি ছাড়ার কথা বলে নতুন চাকরির কথা বলল।

আবিদ বলল, আল্লাহ তোর সহায় হোক। মনে হচ্ছে, এতদিনে তিনি তোর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে রফিক পাসপোর্ট অফিসের কাজ সেরে বেলা দুটোর সময় বাসায় ফিরল। সেদিনও সে আর কোথায়ও গেল না। চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করল, লিজাদের চাকরি নিয়ে মাকে সাথে করে লণ্ডন চলে যাবে।

দু'দিন পর রফিক সকালে নাস্তা খেয়ে লিজাদের বাসায় গেল। গেট দিয়ে ঢুকে রফিক লনের মাঝামাঝি এসেছে, এমন সময় তার লক্ষ্য পড়ল লিজাদের বারান্দায় ধস্তাধস্তী হচ্ছে। লিজার বডিগার্ড রবার্ট নানিকে জড়িয়ে ধরার জন্য চেষ্টা করছে, নানি কৌশলে তাকে আঘাত করে সরে যাচ্ছে। আর লিজা রবার্টের পিঠে কিলে মেরে তাকে বাধা দিচ্ছে। রাবার্ট লিজাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে নানিকে ধরার চেষ্টা করছে।

রফিক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ছুটে উপরে এসে নানিকে আড়াল করে দাঁড়ল।

রবার্টের সে কি ভীষণ মুর্তি। একটু বয়স হলে কি হবে, লম্বা চওড়া পেটাই শরীর। যে কেউ দেখলে বুঝতে পারবে লোকটা প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী।

তার সেই ভয়াবহ মুর্তি দেখে রফিক ক্ষণিকের জন্য ঘাবড়ে গেল। পরক্ষণে তা সামলে নিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে রুখে দাঁড়ল। নানিকে বলল, আপনি এখান থেকে সরে যান।

নানি সরে যেতে রবার্ট রফিককে আক্রমণ করল? রফিক তার আক্রমণ ব্যর্থ করে পাল্টা আক্রমণ চালাল। রফিকের আক্রমণ রবার্ট ব্যার্থ করে দিল। রফিক বুঝতে পারল, এভাবে লড়লে বরার্টকে ঘায়েল করা শক্ত। সে তখন বুদ্ধির আশ্রয় নিল। তারপর সে আক্রমণ করার চেষ্টা না করে আত্মরক্ষা করার কৌশল অবলম্বন করল। রবার্টকে ক্লান্ত করার জন্য যতটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করা দরকার শুধু ততটুকু প্রয়োগ করল।

রফিক আঘাত করার চেষ্টা করছে না দেখে বরার্ট মনে করল, রফিককে তাড়াতাড়ি ঘায়েল করতে পারবে। তাই সে পূর্ণ উদ্দমে তাকে আঘাত করে চলল। কিন্তু রফিক অদ্ভুত কৌশলে রবার্টের সব রকমের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়ে নিজেকে অক্ষত রাখল। রবার্ট যতই শক্তিশালী হোক তার বয়স হয়েছে। ক্রমশ হাঁপিয়ে উঠতে লাগল।

রফিক যখন তা বুঝতে পারল তখন সে সমস্ত শক্তি দিয়ে রবার্টকে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে তুলল। অবশেষে আরও কিছুক্ষণ লড়বার পর রফিক রবার্টকে প্যাচে ফেলে মেঝেয় ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসল।

তখন নানি তাড়াতাড়ি সেখানে এসে রফিককে বলল, ওকে ছেড়ে দাও ভাই। তুমি বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এস। আমি ও লিজা তোমাদের শুশ্রূষা করে দিই।

রফিক কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে বাথরুমে গেল।

রবার্টও উঠে টলতে টলতে অন্য বাথরুমের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে তারা ফিরে এলে নানি ও লিজা তাদের আঘাত পাওয়া জায়গাগুলোতে ডেটল লাগিয়ে দেওয়ার সময় নানি বলল, রফিক তুমি আমাকে ক্ষমা কর ভাই।

রফিক আরো অবাক হয়ে বলল, ক্ষমা চাইছেন কেন? আপনার তো কোনো অন্যায় দেখছি না।

নানি বললেন, অন্যায় কিছু করেছি বই কি? সেদিন লিজার মুখে তোমার বীরত্বের কথা শুনে আমি তা দেখার লোভ সামলাতে পারিনি। তাই আজ তোমাকে আসতে দেখে মিথ্যা অভিনয় করে তোমার বীরত্ব প্রত্যক্ষ্য করলাম। জান, রবার্ট এক কালে ইংল্যাণ্ডের নাম করা

একজন ফাইটার ছিল। তাকেও তুমি হারিয়ে দিয়েছ। সত্যি তুমি বাংলাদেশের গৌরব। তারপর তিনি বরার্টকে কিছু ইঙ্গিত করলেন।

রবার্ট হাসিমুখে এগিয়ে এসে রফিককে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়াতে লাগল। তারপর ছেড়ে দিয়ে হ্যাণ্ডসেক করে বেরিয়ে গেল।

নানি রফিককে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার লড়াই এর কৌশল দেখে মনে হল, তুমি বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছ।

রফিক বলল, বিদেশে যাওয়ার ভাগ্য আমার হয়নি। আমি যখন প্রথম ঢাকায় আসি, তখন একবার হাইজাকারদের পাল্লায় পড়ি। আমার কাছে কিছু না পেয়ে আমাকে খুব মারধোর করে ছেড়ে দেয়। সে দিন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলাম, "হে আল্লাহ, আবার হাইজাকারদের কবলে পড়ার আগে তুমি আমাকে তাদের শায়েস্তা করার মতো ক্ষমতা ও কৌশল শেখার সুযোগ দান করো।" তিনি আমার ফরিয়াদ বোধ হয় কবুল করেছিলেন। কয়েক মাস পর যখন আমি কলেজে ভর্তি হলাম, তখন আমাদের ক্লাসের একটা ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। কথায় কথায় একদিন তাকে আমি আমার মনের ইচ্ছা জানাই।

সে তখন বলল, আমার বড় ভাই বাংলাদেশের জুডো কারাতের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেয়। আমাদের বাড়িতে আজ তুই চল, বড় ভাইয়ার সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দেব।

সেদিন সে আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার বড় ভাইয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আমি তখন তাকে আমার মনের কথা জানালাম।

তিনি বললেন, ছোট ভাই এর বন্ধু হিসাবে আমি তোমাকে শেখাব। কিন্তু তোমাকে তার আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, জীবনে কোনো দিন এই শিক্ষাকে অন্যায় কাজে লাগাবে না। শুধু নিজের প্রয়োজনে অথবা বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করার কাজে লাগাবে।

আমি তৎক্ষণাৎ তার হাতে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম। তিনি জাপান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। তার পরেরদিন থেকে আমি প্রতিদিন ওঁর কাছে শিখতে যেতাম। আমার সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই এবং আরও অনেকে প্রশিক্ষণ নিত। উনি আমার ক্ষিপ্রতা ও কৌশল দেখে খুশী হয়ে সব কিছু শিখিয়েছেন। এমন কি আমার বন্ধু তার আপন ভাই হয়ে যা পারেনি, আমি তা অর্জন করেছি। তাই সব সময় আল্লাহর দরবারে আমার ওস্তাদের সহি সালামতের জন্য দো'য়া করে থাকি।

রফিক থেমে যেতে নানি বললেন, তোমরা গল্প কর, আমি একটু বাইরে যাব।

নানি চলে যাওয়ার পর লিজা উঠে এসে রফিকের কাছে বসে ছলছল নয়নে বলল, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার জন্য তোমাকে রবার্টের সঙ্গে লড়তে হল। তোমার কাছ থেকে ক্ষমা না পাওয়া পর্য্যন্ত স্বস্থি পাচ্ছি না।

রফিক কিছু না বলে তার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল।

প্লীজ রফিক, ওভাবে আমার দিকে তাকিও না। সেদিন বললাম না, তোমার ঐ দৃষ্টিকে আমার বড় ভয় করে।

রফিক সহাস্যে বলল ঠিক আছে, আমি আর কোনো দিন তোমার দিকে চাইব না। তারপর সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

লিজা অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভিজে গলায় বলল, আমি বুঝি তাই বললাম? তুমি নিষ্ঠুরের মত এতবড় কথা বলতে পারলে?

রফিক আবার হেসে উঠে বলর, বড় মুস্কিলে ফেললে দেখছি, তোমার দিকে তাকালেও দোষ, আর না তাকালেও দোষ। কি করব, তুমি বলে দাও।

লিজা বলল, আমি লক্ষ্য করেছি তোমার দৃষ্টি দু'রকমের। একটাকে ভালো লাগে আর একটাকে ভয় লাগে। তুমি না.... বলে সে থেমে গেল।

আমি কি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে নির্দয়ের মত ব্যবহার কর বলে লিজা এমন ভাবে তার দিকে চেয়ে রইল, যা দেখে রফিকের মনে হল সে এবার কেঁদে ফেলবে।

তাড়াতাড়ি দুটো হাত জড়ো করে বলল, অপরাধ হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও। আর কোনো দিন অমন করে তাকাব না, যা দেখলে তুমি মনে ব্যথা পাও। হলো তো?

রফিকের সান্তনায় এবং তার বলার ভঙ্গিমায় এবার লিজার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল।

তাই দেখে রফিক বলল, এখানে এসেই লড়াই করলাম, তারপর সেই কখন থেকে বকবক করছি। এদিকে গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

লিজা ভুল বুঝতে পেরে রফিককে অনুকরণ করে বলল, আমার অপরাধ হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও, আর কোন দিন গলা শুকোতে দেব না।

রফিক হাসতে হাসতে বলল, যদি ক্ষমা না করি?

লিজা বলল, গতকাল আমি একটা হাদিসে পড়লাম, আল্লাহপাক বড় ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমাকে ভাল বাসেন, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যে ক্ষমাশীল হয়, তাকে তিনি খুব ভালবাসেন।"

রফিক উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলল, এক্সেলেন্ট? তুমি এত অল্প সময় পড়াশোনা করে আসল জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছ। এটাই তো আমি চাই।

রফিককে আনন্দিত হতে দেখে লিজা স্বভাব সুলভমতো তার ডান হাতে চুমো খেয়ে বলল, আমার এই উন্নতির মূলে তো তুমিই।

না আমি মাত্র অসিলা। এটা তোমার সুন্দর মনের বিকাশ।

আচ্ছা, আমি যে তোমার হাতে চুমো খেলাম এটাও কি ইসলাম বিরোধী কাজ?

হ্যাঁ, তবে তোমার কোনো দোষ হয়নি। কারণ এটা তোমাদের দেশের রীতি। অন্যায় হত, যদি তুমি মুসলমান হতে। যাক ওসব কথা বাদ দিয়ে এখন একটু গলা ভেজাবার ব্যবস্থা কর।

লিজা লজ্জা পেয়ে বলল, সরি, ভুল হয়ে গেছে। তারপর চলে গেল। একটু পরে নাস্তা ও কফি নিয়ে ফিরে এসে পরিবেশন করতে করতে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কর!

কিন্তু ভয় করছে যে?

আমাকে ভয় পাওয়ার কি আছে? আচ্ছা বলতে পার, কি করলে তুমি আমাকে ভয় পাবে না?

তাতো জানি না।

রফিক হেসে ফেলে বলল, কি জিজ্ঞেস করবে বলছিলে নির্ভয়ে বল।

লিজা বলল, অনেক চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব। কথাটা শেষ করে সে মাথা নিচু করে রইল।

লিজার কথা শুনে রফিকের মনে আনন্দের তুফান বইতে লাগল। সে খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে লিজার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ রফিকের সাড়া না পেয়ে কম্পিত নয়নে ধীরে ধীরে তার দিকে তাকাতে চার চোখের মিলন হল।

লিজার মনে হল, রফিকের এতদিনের দৃষ্টির মধ্যে আজকের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দৃষ্টিতে গভীর প্রেমের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। তখন সে ভয়ের পরিবর্তে প্রেমের সাগরে ডুবে

গেল। দুজন দুজনের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইল। বাহ্যিক জ্ঞান তাদের লোপ পেল। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর রফিক নিজেকে সংযত করে নিয়ে দেখল, লিজা তার দিকে সম্মোহিতা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে, আর তার চোখের অশ্রুবিন্দুগুলো নিটোল গোলাপী গাল বেয়ে টপটপ করে মুক্তার মতো পড়ছে।

তাকে ঐ অবস্থায় দেখে রফিকের খুব মায়া হল। সে উঠে এসে তার মাথায় একটা হাত রেখে বলল, তোমার সিদ্ধান্ত শুনে আমি এত বেশি আনন্দিত হয়ে পড়েছিলাম যে, তোমার সঙ্গে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। জীবনে আজ পর্যন্ত এত আনন্দ, এত শান্তি, আর কখনো পাইনি। জিজ্ঞেস করল, নানিকে এ কথা বলছ?

রুমালে চোখ মুখ মুছতে মুছতে লিজা বলল, না বলিনি, আজ বলব।

রফিক বলল, এত তাড়াতাড়ি করার কি আছে? ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে পড়াশোনা করে আরো বেশী করে জেনে নাও।

লিজা বলল, তাতো জানবই। তারপর তাকে নাস্তা খেতে বলে তুমি নাস্তা খাবে না? একটু আগে খেয়েছি। দুকাপ কফি বানিয়ে এক কাপ রফিককে দিল আর একটা নিজে নিল।

নানি কোথায় গেলেন?

বৃটিশ হাই কমিশনারের কাছে।

আজ আবার কেন?

তোমাদের যাওয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা করতে।

আচ্ছা, আমি যে তোমাদের সঙ্গে যাব, একথা আমাকে জিজ্ঞেস না করে ব্যবস্থা করছ কোন বিশ্বাসে?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি যাবে। নানি অবশ্য বলেছিলেন আগে তোমার মতামত জেনে ব্যবস্থা করবেন। আমি তাকে বলেছি তোমাকে না নিয়ে যাব না।

রফিক বলল, আমার প্রতি তোমার এত বিশ্বাস জন্মাল কি করে? আর তুমি জোর করলেই যে আমি যাব, সে কথা ভাবলে কেমন করে?

লিজা মাথা নিচু করে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল। তারপর রফিকের দিকে চেয়ে বলল, তুমি আমার ভালবাসাকে সন্দেহ কর? তুমি জান না রফিক, আমি যখন অন্ধকারে পথের সন্ধানে মাথাকুটে মরছিলাম তখন তুমি জ্ঞানের প্রদীপ নিয়ে আমার সামনে দাঁড়ালে। আমি সেই প্রদীপের আলোতে আলোকিত হয়ে সত্য পথে চলে জীবনকে ধন্য করতে চাই। আর সেই পথ প্রদর্শকের পদসেবা করে তৃপ্ত হবার বাসনা রাখি। সব বিধর্মী ও বিজাতীয় মেয়েদের এক দৃষ্টিতে বিচার করো না, প্লীজ।

লিজার কথাগুলো যে হৃদয় নিংড়ান তা উপলব্ধি করে রফিক বলল, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। আমার সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয়। আমাকে কতটুকু চিনেছ জানি না, আমি বই-পুস্তক পড়ে ও সমাজের চিত্র দেখে জেনেছি ছেলে মেয়েরা তাদের জীবনসাথী নিজেদের স্বল্প জ্ঞানের দ্বারা নির্বাচন করতে গিয়ে শতকরা নব্বই-পাঁচানব্বই জন ভুল করে। আর তার পরিনতি হয়, ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনে অশান্তির দাবানল। তাদের মধ্যে অনেকে এই দাবানল সহ্য করে জীবন কাটাচ্ছে। বাকি সবাই ডিভোর্স নিচ্ছে বা দিচ্ছে। তাই বলছিলাম, আরও কিছুদিন ভালভাবে চিন্তা করে দেখ এবং আমার চরিত্র সম্বন্ধে আরও বেশি করে জেনে নাও। তাড়াহুড়া করে কিছু করতে নেই। এটা শয়তানের কাজ। তুমি যে পথে এগোচ্ছ তা খুব দুর্গম। কিন্তু গন্তব্য স্থান খুব আনন্দময় ও শান্তিময়। যদি গন্তব্য স্থানের এবং সেই পথে পাড়ি দেওয়ার জ্ঞান ও ধৈর্য কারও থাকে, তবেই সে মকসুদে মঞ্জিলে পৌঁছে আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করতে পারো।

লিজা বলল, তোমার কথাটা ঠিক ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম না।

রফিক বলল, আমি যে কথাগুলো এখন বললাম, তার দুটো দিকে আছে একটা জাগতিক আর অন্যটা আধ্যাতিক। পরে এক সময় তোমাকে আধ্যাতিক দিকের কথা বলব। এখন জাগতিক দিকটা বুঝাতে গিয়ে একটা ঘটনা বলছি শোন, তাহলে বুঝতে পারবে। ছেলেবেলায় সিনেমাতে একটা উর্দু ছবি দেখেছিলাম। তার একটা ডায়লগ আজও আমার অন্তরে গাঁথা হয়ে আছে।

এক প্রজাবৎসল বাদশাহর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র বাদশাহ হলেন। তিনিও পিতার ন্যায় ক্রমশঃ প্রজাদের প্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু বাদশাহ এখনও বিয়ে করছে না কেন? এ প্রশ্ন বাদশাহর উজীর, নাজীর, সভাসদগণ এবং সারা দেশের প্রজাদের কাছে আলোচনা হতে লাগল। শেষে সভাসদবর্গ এই কথা বাদশাহকে জিজ্ঞেস করার জন্য উজীরকে মনোনিত করল। উজীর মানে জান তো?

লিজা বলল, খুব সম্ভব সভাসদবর্গের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ।

হ্যাঁ, প্রায় ঠিক বলেছ। এক কথায় যাকে আমরা প্রধানমন্ত্রী বলি। উজীর সাহেব একদিন সভা চলাকালে কথাটা বাদশাহকে বললেন।

উজীরের কথা শুনে বাদশাহ বললেন-

"সাদী জিন্দেগীকা সওয়াল হ্যায়, জো জিৎগ্যায়া উসকো জান্নাত মিল গ্যায়া, আওর জো হার গ্যায়া, উসকো জাহান্নাম মিল গ্যায়া।ঃ

অর্থাৎ বিয়ে সারা জীবনের ভালমন্দের প্রশ্ন। বিয়ে করে যে সদগুণ বিশিষ্ট মনের মত স্ত্রী পেল, সে পৃথিবীতেই বেহেস্তের সুখ ভোগ করবে। আর যে বিয়ে করে অসৎগুণের স্ত্রী পেল, সে পৃথিবীতেই দোজখের ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করবে।

সেই জন্য আল্লাহর কাছে সব সময় প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার জীবন সঙ্গিনীকে ধর্মীয় গুণে গুণান্বিত করেন।

লিজা জিজ্ঞেস করল, শুধু ধর্মীয় গুণে গুণান্বিতা নারী তোমার কাম্য? অন্যান্য গুণে গুণান্বিতা নারী বুঝি ভালো না?

রফিক বলল, তা কেন? সবগুণই ভাল। তবে ধর্মীয়গুণ হল সবগুণের মা স্বরূপ।

তার মানে?

তার মানে বোঝার জন্য একটি হাদিস বলছি শোন।

এমন সময় নানি বাইরের কাজ সেরে ফিরে এসে তাদের দুজনকে দেখে বললেন, তোমরা এখনও গল্প করছ?

লিজা বলল, প্লীজ নানি, চুপ করে বসুন। রফিক একটা হাদিস শোনাবে।

নানি বললেন, বলতো ভাই হাদিসটা আমিও শুনি।

রফিক বলতে আরম্ভ করল, একদিন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সঙ্গীদের নিয়ে মসজিদে বসে ছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, হুজুর, আমি মুসলমান। সমস্ত পাপকাজ ত্যাগ করতে চাই। কিন্তু কোনোটাই ত্যাগ করতে পারছি না। এর প্রতিকারের উপায় বলে দিন।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বললেন-

"তুমি সমস্ত পাপ কাজ করো, শুধু মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দাও। তাহলেই তুমি খাঁটি মুসলমান হয়ে যাবে।ঃ

লোকটা খুশীতে বাগেবাগ হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় ভাবল, আমি তো চুরি করি, মদ খাই, ব্যাভিচারী করি। সবই যখন করতে পারব তখন আর মিথ্যা বলাটা ছেড়ে দেওয়া আর এমন শক্ত কি?

অভ্যাস মত রাতে সে মদের দোকানের দিকে মদ খাওয়ার জন্য রওয়ানা দিল। পথে হঠাৎ তার খেয়াল হল, আগামী কাল রাসূল (দঃ) যখন জিজ্ঞেস করবেন, গতকাল কি করে কাটিয়েছ? তখন তো তাঁকে মদ খেয়ে কাটিয়েছি বলা যাবে না। আর তা যদি বলতে না পারি, তাহলে মিথ্যা বলতে হবে। তার চেয়ে মদ আর খাব না। এই মনে করে সে ব্যাভিচার করার জন্য সেই পথ ধরল। কিছুদূর যাওয়ার পর তার মনে ঠিক পূর্বের মত প্রশ্ন জাগল এবং তা থেকে বিরত হয়ে চুরি করার জন্য এক ধনী বণিকের গৃহের দিকে হাঁটতে লাগল। অল্প কিছু দূর যাওয়ার পর আবার তার মনে একই প্রশ্নের উদয় হল। শেষমেস সেরাতে সে কোনো খারাপ কাজ করতে না পেরে বাড়িতে ফিরে এসে এক অনাবিল শান্তি অনুভব করল এবং সে বাকি রাতটুকু আল্লাহর স্মরণে কাটিয়ে দিল। তারপর সে আর কোনো দিন পাপ কাজ করতে পারে নাই। ধীরে ধীরে তার চরিত্র পবিত্র থেকে পবিত্রতর হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর প্রিয় পাত্রদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেল।

ওদিকে লোকটা যখন ফিরে গেল, তখন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর সঙ্গীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি লোকটাকে সব পাপ কাজ করতে বলে শুধু মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করলেন, এটা আমরা বুঝতে পারছি না।

হযতর মুহাম্মদ (দঃ) বললেন-

সব পাপ কাজের মা হল মিথ্যা কথা বলা। বাকিটা তোমরা ঐ লোকটা আগামী কাল এলে জানতে পারবে।

পরের দিন লোকটা আসার পর হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাকে গতকালের কাজের বর্ণনা দিতে বললেন।

লোকটা তখন সবকিছু খুলে বলল।

এবার তাঁর সঙ্গীরা বুঝতে পারলেন, কেন তিনি মিথ্যা কথাকে সকল পাপ কাজের মা বলেছিলেন।

এই হাদিসের আলোকে এটাই জানা যায় যে, নারীর মধ্যে ধর্মীয়গুণ থাকবে, সে যেমন মিথ্যা বলবে না, তেমনি কোনো দিন এমন কোনো গর্হিত কাজ করতে পারবে না, যা করলে তার স্বামী অসন্তুষ্ট হবে।

বিয়ের ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন,

চারটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য করে পত্নী নির্বাচন করা হয়-ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারী। দ্বীনদার নারী দেখে স্ত্রী নির্বাচন করো, তোমার মঙ্গল হবে। এই হাদিসের ব্যাখ্যা হল-বিয়ের পাত্রী নির্বাচনের জন্য সাধারণতঃ এ চারটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য করা হয়ে থাকে। কেউ ধনে প্রলুব্ধ হয়ে, কেউ বংশমর্যাদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, কেউ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়ে এবং কেউ নারীর চরিত্র ও দ্বীনদারীকে নির্বাচনের বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করে। কিন্তু রাসুলে করিম (দঃ) মুসলমানদিগকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এগুলোর মধ্যে পত্নী নির্বাচনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ গুণ হল, ঐ চতুর্থ গুণটি অর্থাৎ যাকে বলা যায় চারিত্রিক সততা ও ধার্মিকতা। আমার বিবেচনায় ধর্মীয় গুণ অর্জন করতে হলে তাকে ধর্মীয় বই পড়তে হবে এবং সেই সঙ্গে তাকে পার্থিব জ্ঞান ও আহরণ করতে হবে। কেন না সমস্ত সৎকাজের মূল উৎস হল সৎ জ্ঞান। এবার বোধ হয় আমার কথা বুঝতে পেরছ?

লিজা মন্ত্রমুগ্ধের মতো রফিকের কথা শুনছিল। সে রফিরকের সঙ্গে যত মিশছে আর যত বিষয়ে কথা বলছে, ততই তার ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে নিজেকে তার মধ্যে বিলীন করে দিতে ইচ্ছা করছে। সে চুপচাপ রফিকের দিকে চেয়ে রইল।

লিজাকে ঐ ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে রফিক নানিকে বলল, আপনার নাতনি আমাকে তার দিকে তাকাতে নিষেধ করে সেটা সে নিজে প্রয়োগ করছে।

নানি বললেন, তাই নাকি? এই লিজা, রফিকের কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন?

নানির কথায় লিজা সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কী যেন বলছিলেন?

তুই রফিককে তোর দিকে চাইতে নিষেধ করেছিস কেন?

সেটা আমাদের দুজনের নিজস্ব ব্যাপার, বলতে পারব না।

তাহলে তো ভালই। তারপর রফিকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পাসপোর্টের ব্যবস্থা করেছ?

হ্যাঁ গতকাল সবকিছু পাসপোর্ট অফিসে জমা দিয়েছি। সপ্তহখানেকের মধ্যে ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে লিজা জিজ্ঞাস করল, ইনশাআল্লাহ মানে কি?

রফিক বলল, আল্লাহ যদি রাজি থাকেন?

নানি বললেন, লিজা একটু ধৈর্য্য ধরে বস। আমার কথা শেষ হয়ে গেলে যত ইচ্ছা মানে বুঝে নিস। তারপর রফিককে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বোধ হয় চাকরিতে ইস্তাফা দিয়েছ?

রফিক মাথা নেড়ে সায় দিল।

তোমার তো এখন টাকার দরকার। তারপর লিজাকে বললেন, হাজার পাঁচেক টাকা এনে ওকে দাও।

লিজাকে উঠতে দেখে রফিক তাড়াতাড়ি বলল, না-না লিজা, তুমি বস, আমার এখন টাকার দরকার নেই।

নানি বললেন, দরকার নেই মানে? তোমাকে সব কিছু গোছ-গাছ করে যাওয়ার প্রস্তুতী নিতে হবে না? এসব করতে হলে টাকার দরকার। তোমাদের পাসপোর্ট পেয়ে গেলে আমাকে এনে দিও। আমি ভিসার ব্যবস্থা করব। তুমি টাকা নিতে দ্বিধা করছ কেন? আমরা তোমাকে দয়া দেখাচ্ছি, একথা কখনো মনে করবে না। সেদিন তো আমিই তোমাকে চাকরিতে ইস্তাফা দিতে বললাম, এখন থেকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিলাম। যা লিজা টাকাটা নিয়ে আয়। এ টাকা তুমি তোমার বেতনের এ্যাডভান্স হিসাবে নাও। প্রয়োজন হলে আরও চেয়ে নেবে। এতে লজ্জার কি আছে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর হয়ে বললেন, এই কম্বদিন কুরআনের ট্র্যানশ্লেট পড়ে আমি খুব গভীরবাবে চিন্তা করে দেখেছি, বর্তমানে পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা নাকি মানুষকে ইহকাল ও পরকালে সুখ-শান্তি দিতে পারে। তাই মনস্থ করেছি, আমি ও লিজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব। অবশ্য ধর্মান্তরের ব্যাপারে লিজার স্বাধীনতা আছে। তুমি কি বল?

রফিক বলল, নিশ্চয়। ধর্মান্তরের ব্যাপারে আল্লাহ কারো উপর প্রেসার দিতে নিষেধ করেছেন।

লিজা টাকা নিয়ে ফিরে এসে কথা শুনছিল। নানির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তো কিছুক্ষণ আগে রফিককে তাই বলছিলাম।

নানি রফিককে বললেন, তাহলে আমাদেরকে ধর্মান্তরিত করার ব্যবস্থা কর।

রফিক আলহামদুলিল্লাহ বলে চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে গেল। তার অন্তর তখন স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেই সাথে মনে আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করল সে নিজেকে সংযত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করল; কিন্তু পারল না।কয়েক মুহূর্ত পর ওরা

দেখল, অত সংযমী, দৃঢ়চেতাও অসাধারণ শক্তির অধিকারী রফিকের চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

নানি খুব আশ্চার্য হয়ে বলে উঠলেন, কি হল রফিক? তোমার চোখে পানি কেন?

রফিক কোনো সাড়াতো দিলই না, বরং সে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সিজদায় গিয়ে আল্লাহপাকের দরবারে কোটী কোটী শুকরিয়া জানাবার সময় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

নানি ও লিজা কিছু বুঝতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ পর রফিক মাথা তুলে উঠে বাথরুমে গিয়ে অজু করে এল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ হাত মুছতে মুছতে বলল, কিছু মনে করবেন না। সেই করুণাময়, যিনি সবকিছুর মালিক ও নিয়ন্তা, তিনি আমার মতো একজন নাদান গুণাহগারের মনোবাসনা এত শীঘ্র পুরণ করেছেন জেনে নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি। তাই তাঁর দরবারে জানালাম কোটী কোটী শুকরিয়া অর্থাৎ প্রশংসাগীত গেয়ে কৃতজ্ঞতা জানালাম। এখন আমিই আপনাদের ধর্মান্তরিত করাব।

নানি বললেন, কোনো মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে যেতে হবে না? খৃষ্টান ধম কেউ গ্রহণ করতে চাইলে গীর্জায় পাদ্রির কাছে তাকে যেতে হয়।

রফিক বলল, ইসলামের কোনো কাজ ব্যক্তি বিশেষের উপর ন্যাস্ত নেই। সকলেই সমান। যার যা সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, সে যেই হোক না কেন, তা করতে পারবে।

এবার আমি যা বলব আপনারও তাই বলবেন। রফিক বলল, বলুন আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন্‌কুল্লি জাম্বিও ওয়া খাতিয়াতে ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আম্বলিইল আজীম। অর্থাৎ আমি আমার প্রভুর নিকট সমস্ত পাপ ও ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ও তওবা করিতেছি; যেহেতু সেই মহান আল্লাহতাম্বয়লা ভিন্ন পাপ কাজ হইতে ফিরিবার ও নেক কাজ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। লা ইলাহা ইল্লালালাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নাই, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লালুলাহু ওয়াহ দাহু লা শারীকালাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত, আর কেহ এবাদতের যোগ্য নাই, তিনি এক তাঁর কোনো অংশীদার নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ।

নানি ও লিজা রফিকের সঙ্গে কথাগুলো বলল। এবার রফিক কয়েকবার দরুদ শরীফ পড়ে বলল, আমি এখন মোনাজাত করব, আপনারা আমার মতো হাত তুলে শুধু আমিন বলবেন। রফিক মোনাজাত আরম্ভ করল–

"হে পরম করুনাময় আল্লাহ, তুমি কুল মাখলুকাতের মালিক ও নিয়ন্তা। তুমি সর্বশক্তিমান। তোমার সমত্যুল আসমান ও জমিনের মধ্যে কেউ নেই। তুমি সকল জীবের মধ্যে এবং সমস্ত স্থানে বিরাজমান। সুমুদ্রের তলদেশে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে, তালাবদ্ধ সিন্দুকের মধ্যে, মাতৃ জঠরে, সপ্ত আসমান ও সপ্ত জমিনে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে তুমি নেই। মানুষের ও সকল জীবের মনের খবর তুমি জান। তুমি সমস্ত জীবের রিযিকদাতা। মানুষকে তুমি তোমার মাখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করে তৈরি করেছ। সেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে তোমার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা তোমার সেই হাবীবে পাকের উপর শত শত দরুদ ও সালাম জানিয়ে প্রার্থনা করছি, তুমি আমাদেরকে কবুল কর। এখানে কি ঘটল, তা তুমি জান। যে দুজন নারী তোমার মনোনিত এবং তোমার রাসুলের (দঃ) প্রদর্শিত পথে আশ্রয় নিল, তাদেরকে কবুল কর। আমাদের সবাইকে

ইসলামের পথে দৃঢ় রেখ। আমরা যেন তোমার দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে সেই মত চলতে পারি, সেই ক্ষমতা দান কর। আমরা বিতাড়িত শয়তানের কুপ্ররোচনা হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ক্বুরআনপাকে তুমি বলেছ, "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সে ব্যতীত অন্য কেউ হেদায়েৎ পায় নাঃ (১)। তুমি উত্তম দেহায়েৎ কারী ও উত্তম হেফাজাতকারী। আমরা তোমার কাছে হেদায়েৎ ও হেফাজত প্রার্থনা করছি। তুমি আমাদেরকে এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হেদায়েৎ ও হেফাজাত কর। তুমি উত্তম ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাস, আমরা ক্ষমা চাইছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। আমাদেরকে ধর্মীয়গুণে গুণান্বিত করে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় ও শান্তিময় করে দিও। তুমি কিঞ্চিতের বঞ্চিত দয়া মায়েরদেরকে দান করেছ। তাই সন্তানেরা যখন মায়ের কাছে আবদার করে তখন তারা না কিছু দিয়ে থাকতে পারে না। আর তোমার দয়ার কোনো শেষ নাই। আমরা তোমার সেই দয়ার উপর ভরসা করে যা কিছু চাইলাম তা মঞ্জুর করে আমাদের মনবাসনা পুরণ কর। তোমার হাবীবেপাকের শানে লাখো দরুদ ও সালাম পেশ করে শেষ আরজু করছি-মৃত্যুর সময় আমরা যেন, পড়তে পারি লাইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (দঃ)। তারপর রফিক তার দুই হাত-মুখের উপর বুলিয়ে নামাল।

নানি ও লিজা রফিকের দেখা দেখি তাই করল।

মোনাজাত করার সময় রফিকের কান্নার সঙ্গে তারাও কেঁদেছে। এখন যে যার রুমালে চোখ মুখ মুছল।

তাদের আয়া এদেশের একজন আধাবয়সী মুসলমান। লিজা তাকে এক দিন রাস্তায় ভিক্ষা করতে দেখে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করে। একজন বিদেশী মেম সাহেবকে বাংলায় কথা বলতে দেখে মনে অনেক আশা নিয়ে মেয়েটি বলল, আমি একরাশ যন্ত্রণা নিয়ে এই পথে নেমেছি। আমার ভাগ্য আমাকে এই পথে নামতে বাধ্য করেছে।

লিজা বলল, ভাগ্য আবার কি করল?

মেয়েটি বলল, আমার সব কথা শুনলে বুঝতে পারবেন। লিজা মেয়েটির কথা বলার ধরণ দেখে বুঝতে পারল, সে একদম মুর্খ নয়, বরং কোনো ভদ্র ঘরের অল্পশিক্ষিতা মেয়ে। বলল, বেশ তো বল না শুনি।

মেয়েটি বলল, আমি গরীব ঘরে জন্মে গরিব স্বামীর ঘরে গিয়েছিলাম। প্রায় বিশ বছর সুখে দুঃখে সংসার করি। এর মধ্যে আমাদের একটা ছেলে হয়েছিল। তার নাম সোহেল। সে যখন পূর্ণ যুবক তখন বাংলাদেশে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। সেও মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেয়। অনেকদিন পর এক গভীর রাতে ঘরে ফিরে আসে তার মা বাপকে দেখার জন্য। কারণ তাদের দলের সবাই ট্রেনিং নিতে ভারতে চলে যাবে। কেমন করে যেন পাক বাহিনীর লোকেরা সেই খবর পেয়ে আমাদের ঘরের চারদিকে ঘিরে গুলি করতে লাগল। প্রথমে সোলেহের বুকে গুলি লাগে তখন তার বাপ তাকে ধরতে গেলে তার বুকেও গুলি লাগে। বাপ ও ছেলের অবস্থা দেখে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর কি হয়েছিল জানি না। কারণ আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। সেই থেকে পাগলা গারদে ছিলাম। কয়েক মাস আগে ভালো হলে ভাই এসে দেশে নিয়ে যায়। কিন্তু ভাইয়েদের অবস্থা খুব খারাপ। তার চার পাঁচটা ছেলে মেয়ে। ভাই একজন দিন মজুর। দিন আনে দিন খায়। যেদিন কাজ না জুটে, সে দিন সবাইকে উপোস থাকতে হয়। তার উপর আমি তাদের সংসারে ফিরে যেতে তাদের অভাব আরও বেড়ে গেল। সে সব সহ্য করতে না পেরে শহরে এসে অনেক বাসায় কাজের চেষ্টা করেছি। কিন্তু অচেনা মেয়েকে কেউ কাজে রাখতে চায় না। বলে দুদিন কাজ

(১) সূরা-ক্বাসার্স, আয়াত-৫৬, পারা-২০

করে ঘরের মাল চুরি করে পালাবে। তিন চার দিন উপোস দিয়ে কাটাই। তবু লোকের কাছে হাত পাততে লজ্জা করত। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তাই বাধ্য হয়ে ভিক্ষা করে পেট চালাচ্ছি। আপনি যদি দয়া করে কোনো বাসায় কাজ ঠিক করে দেন, তাহলে ভিক্ষা করার হাত থেকে রক্ষা পেতাম।

লিজার তখন নিজের একটা রান্না করার জন্য মেয়ে দরকার আরণ আকমলদের বাসা থেকে সবে মাত্র সে এই বাসা ভাড়া নিয়ে চলে এসেছে।

জিজ্ঞস করল, লেখা পড়া জান?

মেয়েটি বলল, বাংলা কিছু কিছু লিখতে পড়তে পারি।

ওতেই চলবে বলে লিজা বলল, চল তুমি আমার বাসায় রান্নার কাজ করবে।

সেইদিন থেকে মেয়েটি লিজার কাছে রয়েছে। লিজা তাকে চলন সই ইংরেজীও শিখিয়েছে।

সেই আয়াও এতক্ষণ কফির ট্রে এনে তাদের সঙ্গে মোনাজাতে যোগ দিয়েছিল। এবার সে বলল, আপনাদের কফি।

রফিক তাকেও তার কার্য্যকলাপ দেখে আগেই খুশি হয়েছ। বলল, তুমি আমার মায়ের মতো। আজ তুমি আমাদের কফি বানিয়ে খাওয়াও।

আয়া কফি বানিয়ে সবাইকে দিল।

রফিক জিজ্ঞেস করল, তুমি খাবে না মা?

রফিকের মা ডাক শুনে আয়ার দুম্বচোখে পানিতে ভরে উঠল। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল।

রফিক লিজাকে জিজ্ঞেস করল, আয়া অমন করে চলে গেল কেন? তুমি ওকে কোথায় পেলে?

লিজা ওর সব কথা খুলে বলল।

কফি খাওয়া শেষ হয়ে যেতে আয়া ফিরে এসে ট্রেটা নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে রফিক বলল, শোন মা, দেশের জন্য তোমার এক সোহেল গেছে তো কি হয়েছে? এখনও কত সোহেল জীবিত। কথা শেষ করে রফিক উঠে এসে তার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলল, আমাকে সোহেল বলে মনে করবে মা।

আয়া আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। সে রফিকের মাথায় হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বেঁচে থাক বাবা, জীবনে সুখী হও। তোমার মতো ছেলে যিনি পেটে ধরেছেন, তিনি ধন্য। তুমি আমাকে মা বলে ডেকে আজ আট দশ বছরের শুন্য হৃদয় জুড়িয়ে দিলে। তোমার অনেক কথা বার্তা আমি শুনেছি। তুমি একদিন আমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে বাবা? দেখব সেই মহিয়সী নারীকে, যিনি তোমার মত মানিককে পেটে ধরেছেন।

রফিক বলল, অত বড় করে বলো না মা, আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করো আমি যেন নামের সার্থকতা বজায় রেখে চলতে পারে।

লিজা বলল, আয়া, তুমি এবার যাও। তারপর রফিকের দিকে চেয়ে বলল, তোমার নামের অর্থ কি?

রফিক লিজাকে বলল, আয়া নিশ্চয় তোমার মায়ের বয়সী। তাছাড়া যে যেই কাজ করে তাকে সেই কাজের পদবী ধরে ডাকতে নেই। আল্লাহর কাছে সব মানুষ সমান। তবে তাঁর

কাছে সেই বড়, যে নাকি চরিত্রের দিক থেকে বড়। যার চরিত্র নেই, সে যত বড় ধনী বা বাদশা হোক না কেন, আল্লাহ্‌র কাছে তার কোনো মূল্য নেই। তাই তাঁর রসুল (দঃ) হাদিসে মধ্যে বর্ণনা করেছেন–

'তোমরা যারা পার্থিব জীবনে বড়, তারা নিজেদের দাস দাসীর প্রতি খারাপ ব্যবহার করবে না। নিজেরা যা খাবে, যা পারবে দাস-দাসীদেরকে ও তা খাওয়াবে ও পরাবে। তাদেরকে এমন কাজের হুকুম করবে না যা তাদের পক্ষে কষ্ট সাধ্য।ঃ

লিজা বলল, আমি তো এসব জানতাম না, আর বলব না।

রফিক বলল, ঠিক আছে, তুমি তাকে খালা আম্মা বা আন্টি বলে ডাকতে পার। তুমি আমার নামের অর্থ জানতে চাইছ? রফিক মানে 'বন্ধু। ভালো কথা, এখন তোমাদের নতুন করে ইসলামি নাম রাখতে হবে। এটা রাসুল করিম (দঃ) এর নির্দেশ।

লিজা বলল, তুমিই চয়েস করে বল।

রফিক একটু চিন্তা করে বলল, নানির নাম সালমা বেগম আর তোমার নাম আফরোজা বেগম।

লিজা বলল, অর্থগুলো বল।

রফিক বলল সালমা শব্দটা সালাম থেকে এসেছে। সালাম শব্দের অর্থ শান্তি। তাহলে সালমার অর্থ দাঁড়াচ্ছে শান্তিময়ী। আর আফরোজ হল খুব দামী ও খুব-সুন্দর পাথরের নাম। যা অন্ধকার ঘরে রাখলে ঘর আলোকিত হয়ে যায়। আর বেহেস্তের একটি পাথরের নামও আফরোজ।

আয়া এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তাকে রফিক বলল, খালা আম্মা, এই শুভক্ষণে কিছু মিষ্টিমুখ করাও। কারণ এটাও সুন্নাত।

সঙ্গে সঙ্গে লিজা বলল, সুন্নাত কি?

রফিক বলল, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ব্যক্তিগত, সাংসারিক ও কর্মজীবনে যা কিছু নিজে করেছেন ও অপরকে করতে বলেছেন, সেই গুলোই সুন্নত। আয়া মিষ্টি আনার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নানি রফিককে বললেন, আচ্ছা ভাই, লিজা যে তোমার কাছে প্রতিটা বাক্যের ও শব্দের অর্থ জানতে চায়, এতে তোমার রাগ বা বিরক্তির উদ্রেগ হয় না? অবশ্য লিজার মতো আমারও জানতে ইচ্ছা হয়।

রফিক বলল, এরকম কখনো যেন আপনাদের মনে না হয়। আমার কাছে কেউ কোনো প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলে আমি তার উত্তর দিতে বরং খুব আনন্দ পাই।

এমন সময় আয়া মিষ্টি নিয়ে এসে পরিবেশন করল।

রফিক বলল, খালা আম্মা, তুমি আব্বার সঙ্গে খাও।

লিজা বলল, না আন্টি, তুমি আমার সঙ্গে খাবে এস।

রফিক বলল, আমি আগে ডেকেছি, দেখি তুমি কাকে বেশি ভালবাস?

আয়া হাসি মুখে রফিকের প্লেট থেকে একটা মিষ্টি তুলে লিজার প্লেটে রেখে তার পাশে বসে বলল, নাও খাও। আমি তোমাদের দুজনকে সমান ভালবাসি।

আয়ার বুদ্ধি দেখে সবাই অবাক হল।

এবার নানি বললেন, বোঝা যাচ্ছে, তোমরা কেউ আমাকে ভালবাস না।

রফিক তাড়াতাড়ি করে নিজের প্লেটের মিষ্টিগুলো নানির প্লেটে ঢেলে দিয়ে সেখান থেকে খেতে আরম্ভ করল।

তার দেখাদেখি লিজাও তাই করতে, এক সঙ্গে সবাই হেসে উঠল। লিজার হাসির শব্দ সব থেকে জোর।

রফিক বলল, প্লীজ লিজা, আস্তে হাস। আনন্দ প্রকাশ করার মধ্যে ও বিধি নিষেধ আছে। হাদিস শরীফের মধ্যে আছে, রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "অধিক হাসিও না, কেননা ইহা দ্বারা হৃদয়ের মৃত্যু ঘটে মুখমন্ডলের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়।ঃ তাই এই আইন নর নারীর সবার জন্য। বিশেষ করে নারীদের গলার শব্দ নিজের ঘরের বাইরে না যায়, এটাও হাদিসে আছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) সব সময় মুচকি হাসতেন। যদি কখনো জোরে হাসতেন তখন কোনো শব্দ করতেন না। শুধু ঠোট দুটো একটু ফাঁক হয়ে সামনের দাঁত দেখা যেত। উপস্থিত লোকদের মনে হতো, ওঁর মুখে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল। কারণ ওঁর দাঁতগুলো ছিল সাদা ধবধবে।

হাদীসে আছে "হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (দঃ)-কে অট্টহাসি করিতে দেখি নাই, তিনি অত্যাধিক আনন্দিত হইলেও মৃদু হাসিতেন (১)।ঃ বুখারী

রফিকের কথা শুনে সবাইয়ের হাসি থেকে গেল।

লিজা বলল, ধর্মে এত কড়াকড়ি ভালো নয়।

রফিক বলল, ইসলাম ধর্মের আইনকে অত ছোট মনে কর না। একটা কথা মনে রাখবে, ইসলাম ধর্মের আইন মানুষ তৈরি করেনি। করেছেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই ভালভাবে জানেন, তাঁর সৃষ্ট জীব কি আইনের মাধ্যমে চললে সুখ শান্তিতে দুনিয়ার বুকে বসবাস করতে পারবে। কোনো বিষয়েই তাঁর সমতুল্য জ্ঞান সৃষ্টি জীবের নেই। অতএব প্রত্যেক মানুষের উচিত সৃষ্টি কর্তার সমস্ত বিধি নিষেধ বিনা দ্বিধায় মেনে চলা। দেখছ না, পৃথিবীর মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেও সৃষ্টি কর্তার আইন না মেনে নিজেদের তৈরি আইন দেশে চালাতে গিয়ে কত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

যাই হোক, তুমি যখন এই বিষয়ে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করেছ, তখন ধীরে ধীরে সবকিছু জানতে পারবে। ইমলাম ধর্মের কোনো আইন যদি তোমার কাছে খারাপ বা অযৌক্তিক বলে মনে হয়, তাহলে তুমি আমার কাছে জিজ্ঞেস করবে অথবা আরও পড়তে থাকবে। দেখবে, যত পড়ছ তত তোমার মনের কালিমা এবং দ্বন্দ দূর হয়ে যাচ্ছে। তখন আর ইসলাম ধর্মের কোনো, আইনকেই খারাপ বা কড়া মনে হবে না।

নানি বললেন, বসে বসে শুধু এসব করলে চলবে, আয়ার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি এবার রান্নার জোগাড়ে যাও।

আয়া চলে যাওয়ার পর রফিক দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আমি এবার আসি, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলায়কুম।

লিজাও ওয়া আলায়কুম আস সালাম বলে লিজাও দাঁড়িয়ে বলল, তা হবে না, আজ তুমি আমাদের সঙ্গে খানা খাবে। ও সরি, তুমি তো আবার তোমার মায়ের কথা বলবে। তারপর নানিকে বলল, আপনি কিচেনে গিয়ে আন্টিকে দুস্বজন গেষ্টের কথা বলুন। আমি রফিকের সঙ্গে গিয়ে ওর মাকে নিয়ে আসি।

নানি তাই যা বলে কিচেনের দিকে গেলেন।

রফিককে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লিজা বলল, কই চল।

রফিক বলল, মা যদি জিজ্ঞেস করে মেয়েটা কে?

লিজা বলল, কেন? বলবে আমার..... বলে তার মুখের দিকে চেয়ে থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

কি হল চুপ করে গেলে কেন? বলে দাও কি বলব?

তোমার যা মন চায় তাই বলো।

যা বলব তা যদি তোমার পছন্দ না হয়।

তোমার সবকিছু আমার পছন্দ।

ঠিক আছে চল, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। এখন তুমি একটা ওড়না মাথা ও শরীরের উপরে অংশে জড়িয়ে নাও।

লিজা রফিকের কথামত একটা ওড়না মাথায় ও গায়ে জড়িয়ে বেরুল।

রফিক সেগুন বাগিচায় পাকা দুই রুমের ভাড়া বাসায় থাকে। দুটি রুমের মধ্যে একটি বড় অন্যটি ছোট। বড়টিতে সে থাকে। আর ছোট রুমে রান্না খাওয়া হয়। তার এক পাশে একটা সিঙ্গেল বেডের চৌকি পাতা। সেখানে রফিকের মা কুলসুম বিবি থাকেন। রফিক তার রুমে মাকে শুবার জন্য অনেক জেদাজেদি করেছে। কুলসুম বিবি রাজি হননি। বলেন, তুই অনেক রাত পর্যন্ত আলো জেলে পড়াশোনা করিস, আলোতে আমার ঘুম আসে না। পরে আর রফিক এ ব্যাপারে মাকে কিছু বলেনি।

গাড়ি বড় রাস্তায় রেখে লিজাকে সঙ্গে নিয়ে গেট দিয়ে ঢুকে রফিক মা বলে ডাকল।

কুলসুম বিবি তখন ছেলের ঘরে বসে তার ছেঁড়া বোতামটা জামায় লাগিয়ে আলনায় রাখছিলেন। রফিকের ডাক শুনে দরজার কাছে এসে তার সঙ্গে একটা মেম সাহেবকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

রফিক মাকে সালাম দিয়ে বলল, মা, তোমাকে যার কথা বলেছিলাম, এ সেই। নাম লিজা।

কুলসুম বিবি সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, ঘরে নিয়ে গিয়ে বস।

রফিকের মাকে দেখে লিজার নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। আজ প্রায় পনের বছর আগে মা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সে কথা মনে করে তার চোখে পানি আসার উপক্রম হল। সামলে নিয়ে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন আন্টি?

কুলসুম বিবি মেম সাহেবের পরিষ্কার বাংলায় কথা বলতে ও সালাম দিতে শুনে খুব অবাক হলেন। সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি তো খুব সুন্দর বাংলা বলতে পার? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি এই দেশেরই মেয়ে।

লিজা মৃদু হেসে বলল, আমি লণ্ডনেই বাংলা শিখেছি। তারপর এখানে তো কতদিন হল এসেছি। এখন আপনাকে আমাদের বাসায় যেতে হবে। তারপর রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি মাকে তৈরি হতে বলবে তো?

রফিক বলল, জান মা, লিজা আর ওর নানি, আজ আমার কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সেই আনন্দের জন্য তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। ওদের বাসায় আজ আমাদের দাওয়াত। তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।

কুলসুম বিবি শুনে খুব খুশি হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বললেন, আল্লাগো; তোমার মহিমা কারও বুঝবার ক্ষমতা নেই। তুমি যাকে ইচ্ছা কর তাকে হেদায়েত করে থাক। তারপর রফিককে বললেন, তুই ওকে নিয়ে ঘরে গিয়ে বস, আমি তৈরি হয়ে নিই।

তারা যখন লিজাদের বাসায় ফিরে এল তখন রান্নার কাজ শেষ। নানি এগিয়ে এসে কুলসুম বিবিকে অভ্যর্থনা করে বসাল। নানি তার সঙ্গে ইংরাজীতে আলাপ করা শুরু করলে লিজা কুলসুম বিবিকে বাংলাতে তা বলে দিতে লাগল।

কুলসুম বিবি বাংলায় নানির কথার উত্তর দিলে লিজা আবার ইংরেজীতে সেগুলো নানিকে বলে দিতে লাগল।

একসময় আয়া এসে কুলসুম বিবিকে জড়িয়ে ধরে ভক্তি পদগদ কণ্ঠে বলল, আমাকে

নিজের বোন বলে মনে করবেন। রফিক আমাকে খালা আম্মা বলে ডাকে। আপনার ছেলের মতো ছেলে আমি জীবনে দেখিনি।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে সকলে এক সঙ্গে বসে গল্প করার সময় নানি রফিকের মাকে বলল, আপনাকে ও রফিরকে আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে যেতে হবে। রফিক আমাদের কোম্পাণীতে চাকরি করবে। আপনি রাজি আছেন তো?

কুলসুম বিবি ছেলেকে বললেন, হ্যাঁরে তুই তো আমাকে সে কথা বলিস নি?

রফিক বলল, আজ বলব মনে করেছিলাম, তার আগে উনি বলে দিলেন।

কুলসুম বিবি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, রফিক যা ভালো বুঝবে করবে, তাতে আমার আপত্তি নেই। এখন আমি জোহরের নামায পড়ব।

রফিক লিজাকে বলল, মা অযু করবে, বাথরুমে নিয়ে যাও।

বাথরুম থেকে তারা ফিরে এলে রফিক লিজাকে আবার বলল, তুমি মাকে তোমার রুমে নিয়ে গিয়ে একটা পরিষ্কার কাপড় মেঝেয় বিঝিয়ে দাও।

লিজা উনাকে সঙ্গে করে নিজের রুমে নিয়ে গিয়ে একটা নতুন তোয়ালে ঘরের মেঝেয় বিছিয়ে দিয়ে ফিরে এল।

রফিক নানি ও লিজাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনারা তো নামায পড়তে জানেন না। এবার যতশিঘ্রী পারেন শিখে ফেলুন। কারণ আল্লাহ কুরআন শরীফে বিরাশী জায়গায় নামাযও জাকাতের কথা বর্ণনা করেছেন।

লিজা বলল, জাকাত কি?

রফিক বলল, সবরকমের খরচের পর বাৎসরিক যা উদ্বৃত্ত থাকবে তার শতকরা আড়াই ভাগ গরিবদের দান করাকে জাকাত বলে। পরে তোমাকে আরও বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দেব। এখন শুধু একটু জেনে রাখ–

ইসলাম পাঁচটা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা হল॥কলেমা, নামায, রোযা, হজ্ব ও জাকাত। এই পাঁচটার মধ্যে প্রথম কলেমা, অর্থাৎ যা পড়ে সবাইকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়।

দ্বিতীয় নামায। এটা না করার কোনো অজুহাত নেই।

তৃতীয় রোযা। নাবলক, রোযা অসুস্থ ও পাগল ছাড়া প্রত্যেক মুসলমানকে রোযা রাখতেই হবে।

চতুর্থ ও পঞ্চম-হজ্ব ও জাকাত শুধু ধনীদের জন্য। পরে তোমাদেরকে ক্রমশ আমি জানিয়ে দেব। আমি এখন মসজিদে নামায পড়তে যাচ্ছি বলে সে বেরিয়ে গেল।

সেদিন বাসায় ফিরে কুলসুম বিবি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে লিজার বিয়ে হয়নি?

রফিক বলল, আমাদের দেশের একটা ছেলে লণ্ডনে পড়তে গিয়ে বছর দুই আগে ওকে বিয়ে করেছিল। তারপরের ঘটনা রফিক মাকে সংক্ষেপে বলল।

কুলসুম বিবি সব শোনার পর জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি সত্যি তাহলে তুই ওদের কাছে চাকরি করার জন্য লণ্ডনে যাবি?

হ্যাঁ মা, ভেবে চিন্তে তাই ঠিক করেছি। তোমার কোনো অমত নেই তো?

আমি আর অমত করব কেন? আল্লাহ যদি বিদেশে তোর রুজী– রোজগারে বরকত দেন, তাহলে তো ভালই। কোনো মা কি তার ছেলের ভবিষ্যত উন্নতি দেখতে চায় না?

রফিক লিজাকে বিয়ে করার কথা কি ভাবে মায়ের কাছে তুলবে ঠিক করতে না পেরে চুপ করে চিন্তা করতে লাগল। লজ্জা তাকে কথা বলতে বাধা সৃষ্টি করছে।

ছেলের হাবভাব কিছুটা বুঝতে পেরে কুলসুম বিবি বললেন–কি চুপ করে কি ভাবছিস? কিছু যেন বলতে চাচ্ছিস অথচ বলতে পারছিস না।

রফিক মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, জান মা, লিজা ও তার নানির ইচ্ছা, আমি যেন লিজাকে বিয়ে করি। অবশ্য লিজা সে কথা আমাকে বলেনি। ওর ব্যবহারে ও কথা বার্তায় আমি তা বেশ বুঝতে পেরেছি। লিজার নানি একদিন আমাকে বললনে, দেখ ভাই, লিজার স্বামী লিজার সঙ্গে বেঈমানী করেছিল বলে সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলে এতদিনে হয়তো করেও ফেলতো। তুমি যদি ওকে বিয়ে না ও কর, তবে যেন বন্ধু হিসাবে সব সময় তার পাশে থেকে তাকে সাহায্য করো। আচ্ছা মা, তুমি বলতো, একজন বেগানা মেয়ের বন্ধু হয়ে সব সময় তার সাথে কি থাকা যায়? এটা তো আল্লাহ ও রাসূল (দঃ) এর হুকুমের বরখেলাপ। তাই বলছিলাম, তুমি যদি লিজাকে পছন্দ কর, তাহলে বিয়ে করতে পারি।

মাকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে দেকে রফিক তাকে ছেড়ে দিয়ে সামনে বসে বলল, তুমি কিছু বলছ না কেন?

ছেলের কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে আরও কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, ভালো চাকরির জন্য একটা তালাক দেওয়া মেয়েকে তুই বিয়ে করবি? তাছাড়া লিজার বয়স তোর থেকে বেশি বই কম না।

রফিক বলল, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না মা, আমি ভালো চাকরির জন্য লিজাকে বিয়ে করতে চাচ্ছি না। কেন চচ্ছি, তা আমি এখন তোমাকে বলতে পারব না। আর তালাক ও বয়সের কথা যে বললে, সেসব তুমি কিছু ভেব না। রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। আর খাদিজার (রাঃ) বয়স ছিল চল্লিশ বছর এবং পূর্বে খাদিজা (রাঃ) আরও দুইবার বিয়ে হয়েছিল। ইসলামে যখন এ ব্যাপারে কোনো নিষেধ নেই তখন আমি এটাকে খারাপ ভাবি না। তবে হ্যাঁ, লিজাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হলে আমি তাকে বিয়ে করব না। যদি প্রয়োজন মনে করি তবে বিয়ে না করেও তাকে বাঁচাবার জন্য যত দূর সাহায্য করার করব।

কুলসুম বিবি ছেলের কথা শুনে তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, লিজা তো অপছন্দের মেয়ে না। তার সব কিছু ভালো? তবে ভয় হয়, ওরা খুব বড়লোক। ওদের সাংসারিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে আমাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ। বিয়ের পরে সেসব নিয়ে যদি তোমাদের দুজনের মধ্যে গোলমাল হয়, তবে তখন তুই যা অশান্তি পাবি, তার চেয়ে আমিও কম পাব না।

রফিক বলল, তুমি অত দুঃশ্চিন্তা করছ কেন? আল্লাহ যদি আমাদের তক্বদিরে অশান্তি লিখে রাখেন, তা হলে আমরা কখনো তা রোধ করতে পারব না। লিজা শিক্ষিতা। তার উপর তুমি ও আমি যদি তাকে ইসলামের মধুময় জীবনের রাস্তায় চালাবার চেষ্টা করি। তাহলে ইনশা আল্লাহ আমরা সবাই সুখী হব। তুমি শুধু দোয়া কর মা। সবচেয়ে বড় কথা, আল্লাহ যদি লিজাকে আমার জোড়া করে পয়দা করে থাকেন, তবে এ বিয়ে হবে, নচেৎ হবে না।

কুলসুম বিবি বললেন, তাতো বটেই। তিনি সব কিছুর করার মালিক। তুই যদি লিজাকে বিয়ে করে সুখী হবি বলে মনে করিস, তা হলে আমার কোনো আপত্তি নেই। দোয়া করি, আল্লাহ যেন তোর মনের মকসুদ পুরা করেন।

পরের দিন রফিক বিকেলে লিজাদের বাসায় গিয়ে দেখল, নানি নাতনি বসে আলাপ করছে। সালাম জানিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করল।

লিজা সালামের জওয়াব দিয়ে বলল, ভালেঅ আছি। তুমি কেনম আছ? সকালের দিকে এলে না কেন? মা ভালো আছেন?

রফিক বলল, আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছে। সকালের দিকে একটু কাজ ছিল। তারপর নানিকে বলল, আপনাকে যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ ভাই, লন্ডন থেকে চিঠি এসেছে। ফ্যাক্ট্রীতে কি যেন গোলমাল চলছে। ম্যানেজার শিগ্রী ফিরে যেতে বলেছেন। তা তুমি পাসপোর্ট কবে পাবে?

দুম্ব একদিনের মধ্যে পেয়ে যাব।

তুমি আরও একটু বেশি চেষ্টা কর যাতে করে, দুই একদিনের মধ্যে পেয়ে যাও। পাসপোর্ট পেয়ে গেলে আমি তাড়াতাড়ি ভিসার ব্যবস্থা করব।

কফি তৈরি করার সময় লিজা রফিককে বলল, তোমাকে কিছু নাস্তা দিই?

রফিক বলল, খেয়ে এসেছি। শুধু কফি দাও।

লিজা কফি তার হাতে দিয়ে আবার বলল, তুমি আরও কি কি বই কিনে দেবে বলেছিলে, চল না এখন যাই।

নানি রফিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, যাও তো ভাই, ও যেন আরও কি সব এই দেশের হস্তশিল্পের জিনিস কিনতে চায়, সে সবও কিনে দিও।

তারপর লিজাকে বললেন, তুই ড্রেসটা চেঞ্জ করে আয়। নাস্তা পাঠিয়ে দিচ্ছি খেয়ে তারপর যাবি।

নানি চলে যাওয়ার পর লিজা রফিকের দিকে চেয়ে বলল, এই ড্রেসে গেলে হয় না? সে সালওয়ার কামিজ পরেছিল।

রফিক লিজার পোষাকের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, তোমার আপত্তি না থাকলে চলবে, শুধু ওড়নাটা গায়ে দিয়ে নাও।

নাস্তার পাট চুকিয়ে গাড়িতে উঠে রফিক বলল, প্রথমে কোথায় যেতে চাও ?

বারে! আমি তা কি করে বলব? নানি একটু আগে বললেন না, তুমি আমার ও আমার সবকিছুর গার্জেন হতে যাচ্ছ? তুমি যেখানে যেতে চাও বা যা খুশী করতে চাও তাতে আমার কোনো অমত নেই।

ঠিক বলছতো বলে রফিক ওর দিকে তাকাল।

লিজা আহতস্বরে বলল, এখনও আমাকে সন্দেহ কর?

রফিক তার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, কোনো নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে চাবুক মেরে তোমার গায়ের চামড়া তুলতে আমার মন চাইছে!

লিজা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, কি বললে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

রফিক গম্ভীরতা বজায় রেখে বলল, আমার কথা বুঝতে না পারার কোনো কারণ নেই। তুমি বাংলা খুব ভালো জান। আর কানে কালাও নও।

রফিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তার রুঢ় কথা শুনে লিজার শরীর অবশ হয়ে যেতে লাগল। আর তার দুম্বচোখ পানিতে ভরে উঠল। কোনো রকমে সে উচ্চারণ করল, তাই করে যদি তুমি শান্তি পাও, তবে কর বলে সে রফিকের গায়ের উপর ঢলে পড়ে জ্ঞান হারাল।

তার কথা শুনে লিজার অবস্থা এ রকম হবে রফিক আশা করেনি। একটু পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। তাড়াতাড়ি তাকে সিটে শুইয়ে দিয়ে উপরে উঠে গেল। ভাগ্যিস তখন ড্রইংরুমে কেউ ছিল না। পানির জগটা নিয়ে ফিরে এসে লিজার চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পর লিজা চোখ খুলে তাকাল।

রফিক জগের অবশিষ্ট পানি বাইরে ফেলে জগটা পিছনের সীটে রেখে লিজাকে দুহাতে দিয়ে ধরে তুলে বসিয়ে দিল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুখ মুছিয়ে বলল, প্রমীস করছি, তোমার সঙ্গে জীবনে আর কোনো দিন এ রকম ব্যবহার করব না। বিশ্বাস কর লিজা, আমি একটু পরীক্ষা করার জন্য জোক করে ঐ কথাগুলো বলেছি। তারপর তার দুহাতটো ধরে মাফ চাইল।

লিজা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। রফিকের কথা শুনে ও তাকে মাফ চাইতে দেখে সামলাতে পারল না, তার ধরা হাতদুহাতটো নিয়ে চুমোয় ভরিয়ে দিয়ে বলল, ইংল্যাণ্ড হলে তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে অতিষ্ঠ করে শাস্তি দিতাম।

রফিক বলল, আমার দুর্ভাগ্য, নচেৎ শাস্তিটা যে আমাকে কত আনন্দ দিত, তা উপরের মালিকই জানেন। তারপর সে ভিতরের আয়নাটা এমনভাবে সেট করল যেন লিজাকে দেখতে পায়।

লিজা তা লক্ষ্য করে বলল, তুমি আয়নাটা ওভাবে রাখলে কেন? এটাতো পিছনে লক্ষ্য রাখার জন্য।

পিছনে লক্ষ্য রাখার জন্য গাড়ির দুসাইডে দুটো গ্লাস আছে। গাড়ি চালাতে চালাতে তোমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তোমাকে দেখব না রাস্তা দেখব? তাই আয়নাকে ঐভাবে সেট করলাম।

লিজা বলল, জলদি গাড়ি ছাড়ো, নচেৎ কিছু করে ফেলব। তখন তো আবার রাগ করবে। বলবে বিয়ের আগে এসব করা ইসলামে নিষেধ।

তাহলে তো দেরি করা ঠিক নয় বলে রফিক গাড়ি ছেড়ে দিল। এয়ারপোর্টের দিকে গাড়ি ছুটে চলল।

স্পীডের কাঁটা যখন একশ মাইলের ঘর ছুঁই ছুঁই করছে তখন লিজা ষ্টীয়ারীং হুইল ধরা রফিকের হাতের উপর হাত রেখে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, প্লীজ রফিক, এত স্পীডে গাড়ি চালিও না। যদিও স্পীড আমাকে খুব আনন্দ দেয়, তবু তোমার পাশে বসে ভয় পাচ্ছি।

সামনে রাস্তার পাশে ফাঁকা মাঠ দেখে রফিক রাস্তা ছেড়ে গাড়ি পার্ক করে বলল, তুমি সব কিছুতে ভয় পাও কেন? আল্লাহপাকের উপর নির্ভর করবে। চল নামা যাক।

দুজন গাড়ি থেকে নেমে নরম ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা পরিস্কার জায়গা দেখে ঘাসের উপর সূর্যের দিকে মুখ করে পাশাপাশি বসে পড়ল। আসার পথে একটা মসজিদের সামনে গাড়িতে লিজাকে রেখে রফিক আসরের নামায পড়ে এসেছে। বিকেলের সূর্য কিরণ লিজার মুখের উপর পড়ে সুন্দরী লিজাকে আরও অপূর্ব সুন্দরী করে তুলেছে।

রফিক তন্ময় হয়ে তার দিকে চেয়ে সৌন্দর্য সুধা পান করতে লাগল। রফিককে ঐ অবস্থায় দেখে লিজা বলল, এমন করে কি দেখছ?

লিজা নামে একজন রূপসী মেয়েকে ডুবন্ত সূর্যকিরণ তার লাল আভা ছড়িয়ে আরও কতটা রূপসী করে তুলেছে তাই নয়ন ভরে দেখছি।

আর যে ছেলেটা সেই রূপ উপভোগ করছে, সে যে কত রূপবান তা যদি জানত, তাহলে মেয়েটিকে অপূর্ব সুন্দরী বলত না। তুমি শুধু আমাকে রূপসী বলে ভাব। আমি যে তোমাকে সারা পৃথবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দর ও সুপুরুষ মনে করি, তা কি কখনো ভেবে দেখছ?

তাই নাকি? সে রকম তো ভেবে দেখিনি।

এবার থেকে ভেবে দেখবে বুঝেছ? রফিককে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, জান রফিক, তোমাকে আমি অনেক কিছু বলতে চাই, কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্বের কথা চিন্তা

করে বলতে সাহস হয় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, তুমি মানুষ না। একটা মানুষের মধ্যে কি এত গুণ থাকা সম্ভব? তোমার সত্যিকারের পরিচয় আমাকে বলবে?

রফিক মৃদু হেসে লিজার একটা হাত ধরে চাপ দিয়ে বলল, কী? এবার বিশ্বাস হচ্ছে, আমিও তোমার মত রক্তমাংসের মানুষ? তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, আমার মধ্যে কতটা গুণ আছে জানি না, তবে যা জ্ঞান অর্জন করি, সেগুলোকে নিজের জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করি এবং লোকজনকেও সেই পথে চালাবার চেষ্টা করি। ওসব কথা থাক, আজ তোমাকে কিছু কথা বলব বলে এখানে এনেছি। কথাগুলো শুনে তুমি আমাকে ভাল মন্দ দুটোই ভাবতে পার এবং খুশী অথবা অখুশীও হতে পার। তুমি হয়তো জান, তোমার নানি আমাকে দুটো প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রথমটা হল, আমি তোমাকে বিয়ে করে তোমাদের সংসারের এবং বীজনেসের হাল ধরি। দ্বিতীয়টা হল, যদি তোমাকে বিয়ে করতে কোনো বাধা থাকে, তবে যেন সব সময় তোমার পাশে থেকে বন্ধুর মত তোমাকে সাহায্য করি। আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিই, তারপর গতকাল মায়ের সঙ্গে আলাপ করি। তিনি সবকিছু আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

জান লিজা, আমার মা ও আমি আত্মীয়দের কাছে থেকে অনেক লাঞ্ছনা ও অপবাদ শুনেছি। তারা সব সময় আমাদেরকে অপয়া বলত। কারণ আমার মাকে বাবা বিয়ে করে আনার পর থেকে সংসারে দুর্দিন নেমে আসে। আর আমার জন্মের পর থেকে সেই দুর্দিন ভীষণ আকার ধারণ করে আমাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে দেয়। আমি ও মা ঐ সব কুসংস্কার বিশ্বাস করি না। সব কিছু সেই বিশ্বনিয়ন্তার কুদরত। আমি ছেলে বেলায় ভীষণ দুষ্ট ছিলাম। যার ফলে মাকে চাচাদের ও পাড়ার লোকের অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ, আল্লাহ যদি আমাদের দুজনকে বিবাহের মাধ্যমে এক করে দেন, তাহলে তুমি আমার মায়ের সঙ্গে এমন কথা বলবে না বা এমন ব্যবহার করবে না, যা তার মন-কষ্টের কারণ হবে। আর একটা কথা তোমাকে না বলে থাকতে পারছি না। সত্যি বলতে কি, বিদেশী মেমদের নির্লজ্জতার কারণে আমি তাদেকে ঘৃণা করি। যার ফলে তাদের দিকে ভালো করে কখনো চেয়েও দেখিনি। কিন্তু কেন জানি না, তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমার সে ধারণা পাল্টে গেছে। মনের মধ্যে কেমন যেন এক ধরনের আনন্দের স্রোত অনুভূত হয়। তোমাকে বার বার দেখতে ইচ্ছা করে, তোমাকে সব সময় কাছে পেতে মন চায়।

রফিকের কথা শুনতে শুনতে আনন্দে লিজার হরিণীর মত পটল চেরা চোখ থেকে পানি পড়তে লাগল।

এতক্ষণ রফিক অন্য দিকে চেয়ে কথা বলছিল। কথা শেষ করে তার দিকে চেয়ে বলল, তোমার মতামত জানতে পারলে নিশ্চিত হতে পারতাম। লিজার চোখে পানি দেখে রফিক আবার বলল, তুমি কাঁদছ কেন? আমার কথায় যদি তুমি মনে আঘাত পেয়ে থাক, তা হলে বল আমি আমার কথা উইথড্র করে নিচ্ছি।

লিজা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, রফিক, সত্যি তুমি মানুষ নও, তুমি ফেরেস্তা। এতদিন যেসব ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তারা শুধু আমার দেহও ঐশ্বর্য্যকে ভোগ করতে চেয়েছে বুঝতে পেরে তাদেরকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছি। আল্লাহ আমার মনের কথা তোমার মুখ থেকে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। আমার আর কোনো মতামত জানতে চেয়ো না। তিনি আমাকে যা দিতে যাচ্ছেন, তা গ্রহণ করার ক্ষমতা আমার আছে কি না জানি না। সামনা-সামনি গুণগান করে তোমাকে ছোট করব না। তুমি যে আমাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে চাচ্ছ, সেটাই আমার পরম সৌভাগ্য।

আর তোমার মায়ের কথা যে বললে? তিনি আমারও মা। তাঁকে প্রথম দিন দেখার পর থেকে মনের মধ্যে মায়ের আসনে বসিয়েছি। তারপর সে চুপ করে রফিকের বুকে মুখ রেখে ফোঁপাতে লাগল।

রফিক বলল, প্লীজ উঠে বস। বিয়ের আগে এরূপ আচরণ ধর্মে নিষেধ।

লিজা তাড়াতাড়ি উঠে বসে ওড়নাটা ঠিক করে গায়ে জড়িয়ে রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বলল, আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভুলে গিয়েছিলাম। কথা দিচ্ছি, আর এরকম ভুল হবে না।

রফিক মৃদু হেসে বলল, জাষ্ট লাইক এ গুড গার্ল। চল ওঠা যাক। গাড়িতে উঠে বলল, তুমি আজ নানিকে বলবে কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের কোর্টশীপ করতে চাই। লিজা কোনো কথা না বলে রফিকের হাতের উপর হাত রাখল।

মার্কেট থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস ও কয়েকটা হাদিসের বই কিনে বাসায় ফিরল।

লিজার চোখ মুখে আনন্দের ঘনঘটা দেখে নানি বললেন, তোকে আজ এত আনন্দিত দেখাচ্ছে কেন?

রফিককে জিজ্ঞেস করুণ।

কেন, তুই বলতে পারিস না?

না, আমি বলতে পারব না বলে লিজা রফিককে বলল, তুমি বস, আমি এগুলো রেখে এক্ষুনি আসছি।

লিজা চলে যাওয়ার পর নানি রফিককে গম্ভীর দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার বলতো ভাই? একজনের মুখে হাসি আর অন্য জনের মুখ গম্ভীর। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

রফিক বলল, কথাটা আপনাকে জানাবার জন্য লিজাকে বলেছিলাম।

নানি বললেন, কিন্তু সে তো তোমাকে দেখিয়ে চলে গেল।

রফিক একটু চুপ করে থেকে বলল, অনেক চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মায়ের মতামত নিয়ে লিজাকে আজ বলেছি, আমরা খুব তাড়াতাড়ি কোর্টশীপ করে বিয়ে করব এবং ঐ দিনেই ইসলামী মতে সামাজিক প্রথার ব্যাপারটাও মিটিয়ে ফেলব। কথা শেষ করে সে মাথা নিচু করে নিল।

নানি কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারলেন না। রফিক যে লিজাকে সত্যি সত্যি এত শিঘ্রী বিয়ে করতে চাইবে, এটা যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

নানির দিক থেকে সাড়া না পেয়ে রফিক চিন্তিত মনে তার মুখের দিকে চাইতে চোখে চোখ পড়ে গেল। নানি উঠে এসে রফিকের পাশে বসে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ভিজে গলায় বললেন, তুমি আমাকে মস্ত বড় চিন্তার হাত থেকে বাঁচালে ভাই। তারপর তার মাথায় ও হাতে-চুমো খেয়ে আবার বললেন, আমরা তো খুব তাড়াতাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তুমি কি বিয়ের কাজটা এখানেই সেরে যেতে চাও?

রফিক বলল, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে দুস্বএকদিনের মধ্যে কাজটা সারতে চাই।

বেশ তো, এতে এত চিন্তা করছ কেন? এ ব্যাপারে যা কিছু খরচ সব আমি করব। এখানে কিছু না করলেও লন্ডনে ফিরে খুব জাকমকের সঙ্গে লিজার বিবাহ উৎসব পালন করব। তুমিও প্রস্তুতি নাও। তোর এখন কত টাকার দরকার? পঞ্চাশ হাজার হলে চলবে? না আরও বেশি লাগবে?

লিজা জিনিস পত্রগুলো রেখে ফিরে আসার সময় তাদের বিয়ের কথা শুনতে পেয়ে

দরজার বাইরে থেকে এতক্ষণ সব কথা শুনছিল। নানির মুখে টাকার কথা শুনে খুব ভয় পেল। কারণ সে জানে রফিক খুব সেন্টিমেন্টাল। নানির উপর লিজার খুব রাগ হল।

নানির কথাগুলো শুনে রফিক অপমান বোধ করে খুব রেগে গেল, কিন্তু বাইরে তা একটুও প্রকাশ করল না। রাগকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা তার আছে। তাই সে শুধু একবার চাবুক খাওয়ার মত চমকে উঠে নিজেকে দ্রুত সামলে নিল। ম্লান হেসে বলল, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এখানে টাকার কথা উঠল কেন? কর্তব্যের খাতিরে লিজার উপকার করতে এসে তাকে ভালবেসে ফেলেছি। তাই তাকে বিয়ে করতে চাই। আপনার টাকাকে নয়। মনে হয়, আপনার ও আমার মধ্যে কিছু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে যে কারণে আপনি টাকার কথা তুলেছেন। আপনি গুরুজন। আপনার দোষ দিচ্ছি না। হয়তো ভুল করে কোনো কথা বা কাজ করে ফেলেছি। যার ফলে আপনি টাকা দিতে চাচ্ছেন। না জেনে দোষ করার জন্য মাফ চাইছি। আর একটা কথা, আমি অমিতব্যয়িতা পছন্দ করি না। বেশি ধন সম্পত্তি ও আশা করি না। শুধু ভালভাবে জীবন যাপনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু, তার বেশি নয়। কারণ আল্লাহ ক্কুরআন মজিদে বলিয়াছেন, "এবং আত্মীয়স্বজনের হক আদায় করতে থাক, আর অভাবগ্রস্থ এবং মুসাফিরেরও দান কর এবং বিপথে অপব্যয় করিও না। নিশ্চয় অপব্যয়ীরা শয়তানের ভাই, বস্তুতঃ শয়তান স্বীয় পরওয়ারদিগারের বড়ই অকৃতজ্ঞ।" (১)

ক্কুরআন মজিদে আরো আছে। "এবং পার্থিব জীবন তো কিছুই নহে প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত" (২)।

লিজার বিবাহ উৎসবে হয়তো আপনি দুই তিন লাখ টাকা ব্যয় করবেন। কিন্তু সেটা দশ বিশ হাজারের মধ্যেও হয়ে যেতে পারে। বাকি টাকাটা যদি জনসাধারণের জন্য কনষ্ট্রাকটিভ কাজে ব্যয় করেন অথবা অভাবগ্রস্থকে দান করেন, তা হলে আপনি তো পরকালে তার সুফল পাবেনই, আর দেশের অনেক গরিব ও বেকার লোকের কর্মসংস্থানও হয়ে যাবে। তাতে করে অনেক পরিবারের ভরণ পোষণ চলবে। আমার কথাগুলো আপনাকে চিন্তা করে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

নানি রফিকের সব বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞানের এবং মনের উদারতার পরিচয় পেয়ে অভিভুত হয়ে বললেন, আমি আর কি চিন্তা করব ভাই। তোমার মত মানুষ বর্তমান পৃথিবীতে কয়েকজন থাকলে অনেক কাজে লাগত। পৃথিবীর রংটাই বদলে যেত। তোমার চিন্তাধারা দশের, দেশের তথা সারা বিশ্বের মানুষের জন্য। তুমি আমার বিবেকের দরজা খুলে দিয়েছ। আমি আর কোনোদিন তোমাকে টাকার কথা বলব না। তবে তোমার যখন যা প্রয়োজন তা জানালে খুশী হব। কি? কিছু মাইণ্ড করনি তো?

এতে মাইণ্ড করার কি আছে। আপনি গুরুজন, আপনার কোনো দোষ ধরা আমার অন্যায় হবে। আমি সৃষ্টিকর্তার একজন নগন্য বান্দা। তাঁর ও তাঁর রাসূলের (দঃ) প্রদর্শিত পথে চলার চেষ্টা করছি মাত্র। আপনি দোস্বয়া করুন, আমি যেন সারা জীবন সঠিক পথে চলতে পারি।

নানি বললেন, দোস্বয়া করি, আল্লাহ তোমাদেরকে সুখী করুক। কবে তোমরা কোর্টশীপ করতে চাও?

লিজাকে ডাকুন, ওর সামনে বলতে চাই।

তাকে আর ডাকতে হল না, দরজার বাইরে থেকে শুনে ভিতরে এসে সোফায় বসল।

---

(১) বনি ইসরাইল, ২৬/২৭ আয়াত, পারা-১৫।

(২) সূরা-আল ইমরান, ১৮৫ আয়াতের শেষ আঃ শ, পারা-৪

রফিক তার দিকে চেয়ে বলল, লিজা, আমি আগামী পরশু বেলা এগারটার সময় আসব। তুমি রেডী থেকো। ঐ দিন কোর্টশীপ করতে চাই। তোমার আপত্তি নেই তো?

লিজা বলল, তোমার কথায় কোনোদিন আপত্তি করার দুর্মতি যেন না হয়।

ঠিক আছে, এখন আসি তা হলে বলে সালাম দিয়ে বিদায় নেওয়ার সময় বলল, আল্লাহ্ হাফেজ।

লিজাও সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আল্লাহ্ হাফেজ।

রফিক চলে যাওয়ার পর নানি লিজাকে বলল, তুই তো ওর বাসা চিনিস তাই না?

হ্যাঁ কেন?

কাল সকালে হাজার বিশেক টাকা দিয়ে আসবি।

আপনি তো বলেই খালাস, কিন্তু ও যদি না নেয়। তাছাড়া একটু আগে তাকে বললেন, আর কখনো টাকার কথা বলবেন না। সেদিন যে পাঁচ হাজার টাকা ওকে দিয়েছিলেন সেটা আমার কাছে রেখে দিয়েছে, বলেছে দরকার হলে চেয়ে নেবে।

তাই নাকি বলে নানি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, কাল সকালে টাকাটা তোকে যেমন করে হোক দিয়ে আসতেই হবে। বুঝতে পারছিস না, কেন তার এখন টাকার কত দরকার।

তাতো আমিও জানি। কিন্তু টাকা দিতে গেলে যদি অপমান করে?

করলে তো কি হয়েছে? যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিস, সে যদি কিছু বলে, তাতে কিছু মাইণ্ড করবি কেন? একটা জিনিস বুঝেছি, যা তুই পারিসনি। রফিক কোনোদিন কাউকে অপমান করতে পারে না। একটা কথা সব সময় মনে রাখবি, রফিকের কোনো কাজে বা কথায় যদি তোর মনে কষ্টও হয়, তবু সেটা তাকে বুঝতে দিবি না। সেও তোকে ভালবাসে। আমাদের ঐশ্বর্য্যের প্রতি তার লোভ নেই। যদি থাকত, তাহলে আমি অনেক আগেই তা বুঝতে পারতাম।

লিজা বলল, আপনি যখন বলছেন তখন যাব; কিন্তু যদি কিছু হয়, সে জন্য আপনি দায়ী থাকবেন।

নানি বললেন, তোর এত বয়স হল, এত লেখাপড়া করলি, তবু বুদ্ধি সুদ্ধি এখনও হল না। বুদ্ধি খরচ করে এমনভাবে টাকাটা দিবি, যাতে করে সে না মনে করে আমরা তাকে সাহায্য করছি।

লিজা বলল, বেশ তাই করব।

লিজাদের বাসা থেকে বেরিয়ে রফিক নিউমার্কেটে বন্ধু আবিদের কাছে গিয়ে তাকে বিয়ের কথা বলল।

আবিদ হেসে উঠে বলল, শেষ পর্যন্ত বিদেশী মেম সাহেবের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করবি তাহলে। একেই বলে ভাগ্য। রাজকন্যাকে বিয়ে করে রাজ্যও পেয়ে যাবি।

দেখ দোস্ত, তোর কথা হয়তো ঠিক, কিন্তু এ কথাও জেনে রাখিস, রাজত্বের লোভে আমি বিয়ে করছি না। কেন করছি, তা আমিও আমার উপরের আল্লাহ জানেন। যাই হোক, পরশু দিন মঙ্গলবার তোদের তো ছুটি থাকে। ঐদিন বেলা সাড়ে এগারটার সময় জর্জকোর্টে আসবি।

আবিদ বলল, তা তোর শুভ কাজে কি আর আমি না এসে পারি? নিশ্চয় আসব।

এখন আসি বলে রফিক বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরে এল।

রাত্রে খাওয়ার সময় রফিক মাকে বলল, পরশু কোর্টে রেজিষ্ট্রি করে আমাদের বিয়ে হবে।

কুলসুম বিবি বললেন, মৌলবী ডেকে বিয়ে পড়াবি না?

হ্যাঁ, তাতো পড়াবই। কোর্ট থেকে ফিরে বাসায় সে ব্যবস্থা করব।

পরের দিন রফিক মায়ের সঙ্গে নাস্তা করার সময় জিজ্ঞেস করল, তোমার কাছে কিছু টাকা আছে মা?

কুলসুম বিবি বললেন, আছে; কিন্তু কত আছে জানি না। দাঁড়া এনে দিচ্ছি গুণে দেখ। তারপর তিনি খাওয়া থেকে উঠে সুটকেস খুলে কাপড় জড়ান একটা পুঁটলি এনে দিলেন।

রফিক যখন টাকার কথা মাকে জিজ্ঞেস করছিল, ঠিক সেই সময় লিজা বড় রাস্তায় গাড়িতে রবার্টকে রেখে তাদের বাসায় এসে রফিকের কথা শুনতে পেয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

খাওয়া শেষ করে রফিক হাত মুখ ধুয়ে বাইরে কুল্লি ফেলতে এসে লিজাকে দেখে কুল্লী তাড়াতাড়ি ফেলে সালাম দিয়ে বলল, আরে লিজা, কার সঙ্গে এসেছ? তোমাকে একা কোথাও বেরোতে নিষেধ করেছি না?

সালামের উত্তর দিয়ে লিজা বলল, নানি পাঠিয়েছেন, গাড়িতে রবার্ট আছে।

এস, ঘরের ভিতরে এস।

লিজা ঘরে ঢুকে কুলসুম বিবিকে সালাম দিয়ে বলল, অ্যান্টি ভালো আছেন?

হ্যাঁ মা ভালো আছি। তুমি ভালোতো? তোমার নানি ভালো আছেন? ঐ চৌকিতে বস। খাবার সময় সালাম দিতে নেই।

আমরা ভালো আছি বলে লিজা জুতো খুলে তার পাশে মাদুরের উপর জামাগেড়ে বসে বলল, আমি আপনার সঙ্গে নাস্তা খাব। তারপর অভিমানভরা কণ্ঠে বলল, আপনার ছেলে আমাকে এখানে কখনো খেতে বলেনি।

রফিক মৃদু হেসে বলল, তুমি এখানে আজ নিয়ে মাত্র দুদিন এসেছ। প্রথম দিন মা তোমাকে খাওয়ার কথা বলতে বলেছিলে আজ না অন্য দিন খাবে। আর আজ এসেই তুমি নিজে খেতে বসে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করছ। অথচ আমাকে সে কথা বলার সুযোগও দাওনি।

লিজা বলল, দেখেছেন মা, আপনার ছেলে সব সময় আমাকে শাসনের সঙ্গে কথা বলে। আপনি ওকে একটু বলবেন তো, আমার সঙ্গে যেন ওরকম না করে।

কুলসুম বিবি লিজার সরলতা দেখে হাসি মুখে বললেন, হ্যাঁরে রফিক, তুই লিজাকে সব সময় শাসন করিস কেন? আর করবি না বুঝেছিস? তারপর লিজাকে বললেন, তুমি কি এসব খেতে পারবে মা? রফিক যাতো বাবা দোকান থেকে কিছু এনে দে।

না না, কিছু আনতে হবে না। দেখুন না আমার এসব খেতে কোন অসুবিধা হবে না বলে লিজা এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে ডালে ডুবিয়ে খেতে শুরু করল।

রফিক বলল, কই খাবার আগে বিসমিল্লাহ বললে না যে?

লিজা বলল, ভুল হয়ে গেছে।

রফিক বলল, প্রথমে ভুল হয়ে গেলেও যখনই মনে পড়বে, তখনই বলতে হবে বিসামল্লাহি আউওয়ালু ওয়া আখরু।

লিজা কথাটা কয়েকবার রিপিট করে বলল, দেখলেন তো অ্যান্টি, একটু ভুল করেছি কি অমনি শাসন।

কুলসুম বিবি হাসতে হাসতে বললেন, ও যখন ভুল করবে তখন তুমিও ওকে শাসন করে দিও।

বড় বড় চোখ বের করে লিজা বলল, আপনার ছেলে আবার ভুল করবে? দুনিয়া শুদ্ধ লোকে ভুল করলেও ওর কোনো কিছু ভুল হয় না।

রফিক বলল, এটা তোমার ভুল ধারণা লিজা। কারণ মানুষ মাত্রই ভুল করে। তবে কম আর বেশি। ভুল হয় না একমাত্র শয়তানের।

অল্প খেয়ে লিজা হাত মুখ ধুয়ে এসে সেখানেই আবার বসল।

কুলসুম বিবি বললেন, তুমি চৌকিতে বস না মা। এখানে বসতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে।

লিজা বললেন, না আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, আপনি খেয়ে নিন।

চায়ের পানি চাপিয়ে তিনি ছেলেকে নিয়ে নাস্তা খাচ্ছিলেন। এখন খাওয়া শেষ করে চা বানিয়ে ওদেরকে দিয়ে নিজেও এক কাপ নিলেন।

চা খেয়ে লিজা কুলসুম বিবিকে বলল, আচ্ছা অ্যান্টি বলুন তো, কারো চাকরি হওয়ার পর মালিক পক্ষ যদি তাকে অগ্রিম বাবদ কিছু টাকা দেয়, তাহলে সেই টাকা নেওয়াটা কি অন্যায় হবে?

কুলসুম বিবি বললেন, না, অন্যায় হবে কেন? অগ্রিম যখন, তখন পরে বেতন থেকে সে কিছু কিছু করে কাটিয়ে দেবে।

লিজা আবার বলল, এতে মালিক তাকে কি অপমান করল?

কুলসুম বিবি বললেন, তা কেন? মালিক হয়তো মনে করেছেন তার টাকার দরকার, তাই দিয়েছেন। তাছাড়া সেই টাকা যখন পরিশোধ সাপেক্ষ তখন আর সেখানে মান-অপমানের কথা উঠতে পারে না।

এবার লিজা রফিকের দিকে চেয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু তার চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তে ভয় পেয়ে মাথা নিচু করে চুপ করে গেল।

রফিক তা বুঝতে পেরে নরম সুরে বলল, যা বলতে চাচ্ছিলে নির্ভয়ে বল।

লিজা আর একবার আড় নয়নে তার দিকে চেয়ে নিয়ে বলল, আমার নানি আপনার ছেলেকে চাকরি দিয়ে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। ও টাকা নিয়ে আমার কাছে রেখে দিয়েছে। আমার মন বলছে, ওর এখন অনেক টাকার দরকার।

এতক্ষণে কুলসুম বিবি লিজার আসবার কারণ বুঝতে পারলেন। রফিককে বললেন,

তোর টাকার দরকার বলছিলি না? তা তোর বেতনের টাকা যখন লিজার কাছে জমা আছে, তার কাছ থেকে নে না।

রফিক বলল, মা তুমি বুঝতে পারছ না কেন? আমি এখনও ওদের অফিসে জয়েন করিনি। কি করে অগ্রিম নেব?

লিজা বলল, অফিসে কাজ করলেই বুঝি কাজ করা হয়? আর তুমি যে নানির কথায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাদের কাজ করে বেড়াচ্ছ, সেটা বুঝি কিছু নয়? আজ কোনো কথা শুনবো না, এই নিন অ্যান্টি, নানি ওর বেতনের অগ্রিম বাবদ আরও বিশ হাজার টাকা দিয়েছেন, মোট পঁচিশ হাজার। এই বলে লিজা টাকার বাণ্ডিলটা কুলসুম বিবির দুস্বহাত এক জায়গায় করে তার হাত দিল। তারপর রফিকের দিকে চেয়ে দেখল, সে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

লিজা ছলছল চোখে ভিজে গলায় কুলসুম বিবির দিকে চেয়ে বলল, কি রকম ভাবে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে দেখুন, আপনি ওকে ওভাবে চাইতে নিষেধ করুন। আমার ভীষণ ভয় করছে। তারপর সে দুস্বহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

কুলসুম বিবি কিছু বলার আগে রফিক দৃষ্টিটা সংযত করে নরম সুরে বলল, লিজা, মায়ের হাত থেকে টাকাগুলো নিয়ে আমার কাছে এস। তাকে চুপ করে ফোঁপাতে দেখে রফিক আবার বলল, কই নিয়ে এস।

লিজা রফিকের নরম কণ্ঠস্বর শুনে একটু আশ্বস্ত হয়ে কুলসুম বিবির হাত থেকে টাকার বাণ্ডিলটা নিতে রফিক বলল, এদিকে এসে আমার হাতে দাও।

লিজা ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে রফিকের কাছে এলে সে হাত পেতে নিয়ে বলল, এস আমার ঘরে।

লিজা তার পিছনে পিছনে এল।

রফিক তাকে দুস্বহাত দিয়ে ধরে খাটে বসিয়ে চেয়ারটা তার সামনে এনে তাতে বসে বলল, এবার আমার দিকে তাকাও।

লিজা ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকাল। তখন ও তার চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছিল।

রফিক তার চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে মধুর স্বরে বলল, আমি তোমাকে বলেছিলাম না, দরকার হলে তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেব? তুমি হঠাৎ করে মাকে ওভাবে টাকা দিতে রেগে গিয়েছিলাম। আমিও তো একজন মানুষ। আমারও কিছু দোষ থাকতে পারে। সে জন্য ক্ষমা চাইছি। তোমাকে আমার মনের মত করে গড়ে তোলার জন্য তোমার ভুল সংশোধন করে দিই। সেজন্য তুমি মাকে বলতে পারলে, আমি তোমাকে শুধু শাসন করি? এতে বুঝি আমার মনে আঘাত লাগেনি? তোমাকে কি আমি ভালবাসি না? জেনে রেখ, যদি কেউ আমার অন্তরে আসন পেতে বসে থাকে, সে তুমি। যদি কাউকে আমি মানষী বলে জেনে থাকি, সে তুমি। আমার হৃদয়ে যার নাম সব সময় স্পন্দিত হচ্ছে, তার নাম লিজা। আমার অন্তরে আমার মায়ের পরে যে নারী সব সময় বিরাজ করছে, সে তুমি। তোমাকে ছাড়া আমি অন্য কোনো নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিনি। যে দিকে তাকাই শুধু তোমার ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। তাহলে বল দেখি, কি করে আমি সেই নারীকে শাসন করতে পারি? কি করে তাকে অপমান করতে পারি? যাকে না দেখলে আমার মনে এতটুকুও শান্তি থাকে না। যার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য আমার কান সদাই উদগ্রীব। কি করে তার মনে দুঃখ দিতে পারি? যার কথা না রাখতে পারলে আমার অন্তর ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়।

লিজা ঝরঝর করে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, স্টপ রফিক, প্লীজ স্টপ। আর কিছু বলো না। তুমি যে আমাকে এত বেশি ভালবাস, তা আমি বুঝতে পারি নি। মনে করতাম আমি তোমাকে ভালবাসি বলে হয়তো তার প্রতিদান হিসাবে অথবা মানবতার খাতিরে আমাকে তুমিও ভালবাস। কিন্তু এখন জানতে পারলাম, আমি তোমাকে যতটা ভালবাসি তার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি তুমি আমাকে ভালবাস। তুমি মহান। তোমার ভালবাসা বিশাল মহাসাগরের মত। আর আমারটা সামান্য নদী-নালা। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। হৃদয়ে স্থান দিয়ে আমাকে ধন্য করেছ। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে আবার ফুঁপিয়ে উঠল।

রফিক বলল, কান্না থামিয়ে চোখমুখ মুছে ফেল। এবার হাসি মুখে আমার সঙ্গে কথা বলতো। তোমার হাসি মুখ দেখার জন্য আমার মন ছটফট করছে।

লিজা রুমালে চোখ মুখ মুছে হাসল ঠিক, কিন্তু চোখের পানি রোধ করতে পারল না।

রফিক বলল, এই আবার কাঁদছ।

লিজা হাসি মুখে বলল, আমি কি করব। চোখ যে বাধা মানছে না?

রফিক বলল, মনকে মানও, তাহলে চোখও মানবে। দেখবে আমি কেমন করে মানাব বলে রফিক জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ? তোমার কি কি জিনিস ভালো লাগে?

লিজা হাসি মুখে বলল, আগে কি সব ভালো লাগতো মনে নেই, এখন শুধু তোমার কাছে থাকতে ভালো লাগে।

রফিক বলল, ভালো লাগলে ভালো, কিন্তু যদি ভয় লাগে?

তোমাকে একান্ত করে পেলে ভয়টাও ভালো লাগবে।

রফিক বলল, আচ্ছা দেখা যাবে।

তাই দেখো বলে লিজা বলল, আমি ও নানি আন্টির কাছ থেকে নামায পড়ার কায়দা কানুন শিখে নিয়েছি।

রফিক বলল, খুব ভালো কথা। এবার থেকে তাহলে নিয়মিত নামায পড়।

লিজা বলল, তা তো পড়বই, চল না মার্কেট থেকে একটু ঘুরে আসি।

রফিক বলল, কোনো দরকার থাকলে চল। তা নাহলে আরও কিছুক্ষণ তুমি চুপ করে বস, আমি তোমাকে দুচোখ ভরে তোমার রূপসুধা পান করি।

লিজা বলল, আচ্ছা, তুমি কি করে নিজেকে এত সংযত রাখ? আমার কি ইচ্ছা করছে জান?

রফিক তার মনোভাব বুঝতে পেরেও বলল, কি বল।

তুমি রাগ করবে না তো?

না করব না। তোমার কোনো কথায় রাগ করতে পারি?

আমার না তোমাকে জড়িয়ে ধরে কিস দিতে মন চাইছে বলে লিজা মুখ নিচু করে নিল।

রফিক মৃদু হেসে তার চিবুক ধরে তুলে মুখের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল, আমারও কি কম ইচ্ছা করছে? শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (দঃ) বাণী স্মরণ করে সংযত থাকতে হচ্ছে। লিজা চোখ বন্ধ করে নিতে আবার বলল, এই আমার দিকে চেয়ে দেখ।

লিজা কম্পিত পাপড়ি খুলে চাইল।

রফিক অনুচ্চস্বরে বলল, আর মাত্র একদিন এক রাত। তারপর বিয়ের কাজ মিটে গেলে দেখব কে কাকে কত কিস দিতে পারে বলে আস্তে হেসে উঠল।

লিজা তার ডান হাতে চুমো খেয়ে বলল, আল্লাহ যেন আমাদের মনস্কামনা পুরন করেন।

আমিন বলে রফিক বলল, গুড। সব সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখা উচিত।

কুলসুম বিবির ও ঘর থেকে গলা শোনা গেল, রফিক এদিকে একবার আয় তো বাবা?

রফিক লিজার চিবুক ছেড়ে দিয়ে বলল, চল, মা ডাকছে।

ওরা এ ঘরে এলে তিনি রফিককে বললেন, তুই বাজারে যা, আজ লিজা এখানে খাবে।

লিজা বলল, আমাকে কিন্তু আপনি বাংলাদেশী রান্না শিখিয়ে দেবেন। আজ আমি রান্না করব।

কুলসুম বিবি বললেন, বেশ তো, শিখিয়ে দেব।

রফিক বলল, লিজাকে নিয়ে আমি মার্কেট যাচ্ছি। ও কি কি জিনিস যেন কিনবে। ফেরার সময় বাজার করে নিয়ে আসব।

তাই যা, তবে তাড়াতাড়ি ফিরিস।

আচ্ছা বলে রফিক লিজাকে সঙ্গে করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তাদের দুজনকে আসতে দেখে রবার্ট গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল।

লিজা তাকে কিছু টাকা দিয়ে ইশারা করে বাসায় চলে যেতে বলল।

লিজার কথামত রফিক তাকে নিয়ে প্রথমে নিউমার্কেটে একটা কাপড়ের দোকানে গেল। সেখানে একজোড়া শাড়ী, সায়া, ব্লাউজ ও একজোড়া সালওয়ার কামিজ এবং পাঁচ হাত লম্বা ও আড়াই হাত চওড়া দুই পীস সুতীর ওড়না কিনল।

লিজা কাপড়ের দাম দিতে গেলে রফিক তাকে বাধা দিয়ে বলল, এগুলো বিয়ের আগের কেনাকেটা, তুমি দেবে কেন? নব বধূকে আমারও তো কিছু দিতে মন চাইতে পারে?

লিজা আর কিছু বলল না, গাড়িতে উঠে জিজ্ঞেস কলল, দুই পীস অত বড় কাপড় কিনলে কেন?

রফিক বলর, আল্লাহপাক কুরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন-

"হে বিশ্বাসী নারীগণ! তোমরা যখন কোন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাবে তখন নিজেদেরকে একটা আরবণ দিয়ে ঢেকে নেবে। তোমরা দাসীদের মত বে-আবরু হয়ে চলাফেরা করো না।

"হে নবী আপনার স্ত্রীগণকে ও আপনার কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মুমিনদের নারীদিগকেও বলিয়া দিন যে, তাহারা যেন স্ব স্ব চাদরগুলি নিজেদের (মুখমণ্ডলের) উপর (মাথা হইতে) নিম্নদিকে একটু ঝুলাইয়া লয়, ইহাতে শিঘ্রই তাহারা পরিচিত হইবে, ফলতঃ তাহারা নির্যাতীত হইবে না এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়।"(১)

আপাততঃ তুমি বাইরে বেরোবার সময় ঐগুলো গায়ে দিয়ে বেরোবে; পরে বোরখা কিনে দেব।

লিজা আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি মেয়েদের কেমন পোষাক পছন্দ কর?

রফিক বলল, ঢিলে সালওয়ার-কামিজ ওড়নাসহ পরা বেশি পছন্দ করি।

কাঁচা বাজারের বাইরের গাড়িতে লিজাকে রেখে সে একা বাজার করে নিয়ে এল।

ফেরার সময় লিজা বলল, আমাকে বাজারের ভিতরে নিয়ে গেলে না কেন?

রফিক বলল, হাদিসে আছে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন,

আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান মসজিদ এবং সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় স্থান বাজার (২)।ঃ

---

(১) সুরা আহাজার, আয়াত-৫৯, পারা-২২

(২) বর্ণণায় ঃ হযরত আবু হোয়ায়রা (রাঃ)-বুখারী

রফিকদের বাসায় ফিরে লিজা তার মায়ের সাহায্য নিয়ে রান্নার কাজে লেগে গেল। তাকে এখন রাঁধুনী ছাড়া কিছু ভাবা যাচ্ছে না। সে যে একজন কোটিপতি বিদেশী মেম, এখন তাকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

রফিক একবার এসে তার মুখের ঘর্মাক্ত চেহেরা দেখে বলল, লিজা, মনে হচ্ছে তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, এবার মায়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘরে এসে একটু বিশ্রাম নাও।

লিজা ব্যস্ততার মধ্যে একটু ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হেসে বলল, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। তুমি গোসল করে তৈরি হয়ে নাও। আমার রান্নার কাজ প্রায় শেষ। কেমন রান্না করেছি খেয়ে বলবে।

রফিক বলল, বাংলাদেশী রান্না অত সোজা নয় যে, একদিনেই প্রশংসা পেয়ে যাবে।

লিজা বলল, একদিনে না পারি যতদিন লাগবে ততদিন চেষ্টা করব।

আর কিছু না বলে রফিক গোসল করতে চলে গেল।

রান্নার কাজ শেষ করে লিজা গোসল করে কুলসুম বিবির শাড়ী ও ব্লাউজ পরে রফিকের ঘরে ঢুকে বলল, চল খাবে চল।

রফিক তার ভিজে ভিজে মুখের দিকে চেয়ে বলল, বাঃ খুব সুন্দর লাগছে তো? সত্যি তোমাকে যতই দেখছি ততই দেখার তৃষ্ণা বেড়ে যাচ্ছে। ঐ চেয়ারটায় একটু বস, কিছুক্ষণ তোমাকে দেখে চোখের ও মনের সাধ মেটাই।

লিজা চেয়ারে বসে হাসি মুখে বলল, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি। চল আন্টি ভাত বেড়ে বসে আছেন।

কুলসুম বিবি দুম্বজনকে পাশাপাশি বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন। লিজা আন্টির সঙ্গে পরে খাবে বলেছিল, কিন্তু কুলসুম বিবি তাকে রফিকের সঙ্গে খেতে বললেন।

তবু লিজাকে ইতস্তাতঃ করতে দেখে রফিক বলল, মুরুব্বিদের কথা না শুনা আদবের বরখেলাপ। বেয়াদবি আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) পছন্দ করেন না।

রফিকের কথা শুনে লিজা খেতে বসেছে। রফিকাকে চুপচাপ খেয়ে যেতে দেখে লিজা জিজ্ঞাস করল, কেমন রান্না করেছি বললে না যে?

মা যখন তোমার টিচার তখন কি আর খারাপ হতে পারে? সত্যি বলতে কি, মনে হচ্ছে মায়ের রান্নার হাতটা পুরো পেয়ে গেছ।

কুলসুম বিবি বললেন, ওদেশের রান্না ও করতে জানে। আমি শুধু আমাদের দেশের মতো করে রাঁধতে শিখিয়ে দিয়েছি। মা আমার সব বিষয়ে খুব পটু।

লিজা নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জায় চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগল।

বিকেলে রফিক লিজাকে তাদের বাসায় পৌঁছে দিতে এল। নানি লিজাকে জিজ্ঞেস করলেন, রফিকদের বাসায় বুঝি লাঞ্চ খেয়ে এলি?

লিজার বদলে রফিক উত্তর দিল, শুধু লাঞ্চ খেয়ে নয়, একেবারে নিজের হাতে বাংলাদেশী লাঞ্চ তৈরি করে খেয়ে এসেছে।

তাই নাকি? তাহলে তো খুব ভালো কথা।

তারপর রফিক তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর নানি লিজাকে জিজ্ঞেস করলেন, টাকাগুলি দিতে পেরেছিস?

হ্যাঁ পেরেছি, কিন্তু অনেক বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে বলে লিজা টাকা দেওয়ার ঘটনাটা বলল।

শুনে নানি বললেন, খুব ভালো করেছিস। যা সেন্টিমেন্টাল ছেলে, টাকাগুলো যে নিয়েছে তাই ভালো।

পরের দিন বেলা এগারটার সময় রফিক লিজাদের বাসায় গিয়ে রুমে ঢুকে সালাম দিল।

লিজা তৈরি ছিল। সে গতকালের রফিকের কিনে দেওয়া ঘীয়ে রং এর সালওয়ার কামিজ ও ওড়না পরে নব বধুর সেজে বসে বসে নানির সঙ্গে কথা বলছিল।

সালামের জওয়াব দিয়ে তাকে বসতে বলল, তারপর আন্টিকে ডেকে নাস্তা দিতে বলল।

রফিক বলল, এখন কিছু না শুধু কফি।

আয়া শুনতে পেয়ে এক কাপ কফি দিয়ে গেল।

রফিক কফি খাওয়ার সময় নানি উঠে ভিতরে চলে গেলেন। কফি খেয়ে রফিক লিজার দিকে চেয়ে বলল, তোমাকে আজ এত সুন্দর দেখাচ্ছে, যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আল্লাহকে মালুম আজ আমি পাগল হয়ে যাব কিনা।

লিজা লজ্জা পেয়ে বলল, তোমার চোখে হয়তো আমি সুন্দরী হতে পারি, কিন্তু তোমাকে আমি পৃথিবীর সর্বোত্তম সুপুরুষ বলে মনে করি।

রফিক বলল, তুমি আমাকে যা খুশী মনে করতে পার, কিন্তু সত্যিই তুমি অপূর্ব সুন্দরী।

এমন সময় নানি এসে বললেন, আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারছি না। বিকেলে অনেক গেষ্ট আসবে। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তোমরা যাও। কোর্টের কাজ সেরে সারাদিন যেখানে থাক না কেন, সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরবে। তারপর বললেন, রফিক ভাই ফেরার সময় তোমার মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

তারা যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। এমন সময় আয়া এসে বলল, আজ বুঝি তোমাদের বিয়ে?

রফিক তাকে কদমবুসি কলে বলল, হ্যাঁ খালা আম্মা, তুমি দোওয়া কর।

আয়া রফিকের মাথায় হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে ভিজে গলায় বলল, আল্লাহ তোমাদেরকে সুখ শান্তিতে রাখুক। তোমাদের হায়াত দারাজ করুক। তারপর সে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

রফিক লিজাকে নিয়ে কোর্টে যখন পৌঁছল তখন প্রায় বারোটা বাজে। সে আবিদকে একজন উকিলের ঠিকানা বলে তার কাছে থাকতে বলেছিল। আবিদ সাড়ে এগারটা থেকে সেখানে অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখতে পেয়ে সালাম দিয়ে বলল, একটু লেট করে ফেললাম। তারপর লিজার সঙ্গে আবিদের পরিচয় করিয়ে দিল।

লিজা আবিদকে হসিমুখে সালাম দিল।

আবিদ সালামের জবাব দিয়ে বলল, রফিকের কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি, আজ এমন শুভদিনে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশী হলাম।

লিজা হাসিমুখে বলল, ধন্যবাদ।

বেলা দেড়টার মধ্যে কোর্টের কাজ শেষ হয়ে গেল। রফিক আবিদকে বলল, চল আমাদের বাসায়। অনেকদিন তুই যাসনি। মা তোকে দেখলে খুশী হবে।

আবিদ বলল, এখন তুই আমাকে গুলিস্তানে নামিয়ে দিস, বিশেষ কাজ আছে। সন্ধ্যার পর তোর ভাবিকে নিয়ে আসব।

তাকে গুলিস্তানে নামিয়ে দিয়ে একটা কাগজে লিজার ঠিকানা লিখে দেবার সময় বলল, এই ঠিকানায় আসবি।

নিশ্চয় আসব বলে আবিদ ঠিকানাটা নিয়ে সালাম দিয়ে বিদায় নিল।

গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে রফিক বলল, কোথায় যাবে?

লিজা বলল, এখন তোমার বাসায় চল।

রফিক কিছু না বলে চুপ করে গাড়ি চালাতে রাগল।

লিজা তার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারল, রফিক যেন কিছু চিন্তা করছে। রফিকের একটা হাত ধরে বলল, তুমি যেন কিছু চিন্তা করছ?

রফিক তার দিকে একবার চেয়ে দৃষ্টিটা রাস্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, একটা চিন্তা মনের মধ্যে জট পাকাচ্ছে। সেটা তাড়াবার চেষ্টা করছি; কিন্তু সফল হতে পারছি না।

উৎকণ্ঠিত গলায় লিজা বলল, বল না কি চিন্তা?

রফিক বলল, আমার ভাগ্যের কথা, লোক বিয়ে করে বাবার পয়সায় অথবা নিজের পয়সায়। আর আমি..... বলে সে চুপ করে গেল।

লিজা বলল, প্লীজ রফিক, তুমি এসব চিন্তা করো না। তুমি কেন ভাবতে পারছ না, তোমার বেতনের টাকাতেই সবকিছু করছ? আমাকে কথা দাও, আমাদের টাকাগুলো তোমার বেতনের অগ্রিম বাবদ গ্রহণ করেছ। তুমি সেদিন আন্টিকে বললে, অফিসের কাজ করছ না বলে টাকাগুলো অগ্রিম হিসাবে নিতে তোমার মন চায় না। চিন্তা করে তুমিই বল, মালিক পক্ষ কোনো লোককে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার পর তাকে অফিসের কাজ না করিয়ে যদি অন্য কাজ করায়, তাহলে কি সেই লোকের বেতন নেওয়াটা অন্যায় হবে? রফিককে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, প্লীজ রফিক, তুমি চুপ করে থেক না, কিছু একটা বল, নচেৎ কিছু বলে সে থেমে গেল। তারপর রফিককে তার দিকে চাইতে দেখে কান্না জড়িত স্বরে বলল, তোমাকে কি করে বোঝাই বল, তোমার অমন সুন্দর ও পবিত্রতম চেহারায় চিন্তার রেখা দেখলে আমার হৃদয়ে যে কি হয়? আচ্ছা, আমার কথা ভেবেও কি তুমি ঐ বাজে চিন্তা মন থেকে তাড়াতে পার না? আর সে সামলাতে পারল না, হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

রফিক লিজার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে ঐ চিন্তাটা দুর করে দিল। লিজাকে ফোঁপাতে দেখে ভাবল, টাকার ব্যাপারে ভুল বুঝে তার সঙ্গে অনেক অন্যায় আচরণ করে ফেলেছি।

ততক্ষণে তারা বাসার কাছে পৌঁছে গেল। রফিক রাস্তার এক কিনারে গাড়ি পাক করল। তারপর ঘুরে বসে দুহাত দিয়ে ধরে লিজাকে তার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, এই, হাত নামিয়ে চোখ মুখ মুছে ফেল।

গ্রীষ্মের দুপুর। বড় রাস্তা থেকে রফিকদের বাসা ভিতরের দিকে। এদিকটা আবাসিক এলাকা বলে যানবাহন ও লোকজন কম চলাচল করে। তার উপর এখন গ্রীষ্মের দুপুর। রাস্তা প্রায় নির্জন। লোকজন গরমের দরুণ যে যার আস্তানায়। শুধু মাঝে মাঝে দুএকটা প্রাইভেট গাড়ি যাওয়া আসে করছে।

লিজাদের গাড়ি এয়ারকণ্ডিশান করা। তাই তারা বাইরের গরম অনুভব করতে পারছে না। রফিকের কথায় লিজা মুখ থেকে হাতও নামাল না আর কান্নাও থামাল না।

রফিক আবার বলল, ঠিক আছে, এই প্রতিজ্ঞা করলাম, আর ঐ সব বাজে চিন্তা করব না। আজকের মত মাফ করে দাও। এবার থেকে তোমরা যা কিছু দেবে তা সব বেতন হিসাবে নেব। কই হাত নামাও বলে গলায় শুড়শুড়ী দিয়ে বলল, হাত সরিয়ে আমার দিকে তাকাও, নচেৎ কঠিন শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। তারপর সে লিজাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে সোহাগে সোহাগে তার মুখ ভরিয়ে দিয়ে বুকে জোরে চেপে ধরল।

লিজা সবকিছু ভুলে তাকে জড়িয়ে ধরে ভীত কপোতীর ন্যায় কয়েকবার কেঁপে উঠে নিথর হয়ে গেল।

রফিক লিজার নরম তুল তুলে শরীরের আলিঙ্গন পেয়ে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করতে লাগল। দুস্বজনের হার্টবীট তখন কত বেড়ে গিয়েছিল পাঠক অনুমান করে নিন।

বেশ কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকার পর যখন দুস্বজনের অশান্ত মন শান্ত হল তখন রফিক তার বাঁধন আলগা করে বলল, এই, এবার ছাড়। রাস্তায় কি কাণ্ড করে ফেললাম। কেউ যদি দেখে ফেলতো? চল বাসায় চল।

লিজা খুব লজ্জা অনুভব করে ধীরে ধীরে আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে চোখ মুখ ওড়নাতে মুছে বেশবাশ ঠিক করে নিল। তারপর লজ্জারাঙা মুখে বলল, তোমাদের এখানে বাসর রাত করব। নানির কাছে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা আসব।

রফিক আলতোভাবে ওর নিটোল গালটা টিপে ধরে বলল, কিন্তু সখি, বাসর ঘর সাজাবে কে? তাছাড়া কোনো কিছু কেনাকাটা ও হয়নি।

লিজা তার হাতটায় চুমো খেয়ে বলল, এখনও অনেক সময় আছে। সামাজিক প্রথাটা মিটে যাওয়ার পর তোমাকে একটা লিষ্ট করে দেব, সেগুলো কিনে আনবে। আমরা নিজেরা নিজেদের বাসর সাজাব। হাদিসে পড়েছি-' যে স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি কিছু করে, তাকে আল্লাহ ভালবাসেন।স্ব

লিজার কথা শুনে রফিক বলল, আমিও হাদিসে পড়েছি-'রাসুল করিম (দঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে ভালবাসে এবং স্ত্রী তাকে ভালো বলে জানে।

লিজা বলল, তুমি যে সমস্ত জিনিস পছন্দ বা অপছন্দ কর সেগুলো আমাকে বলবে।

আমি সেইগুলো সানন্দে গ্রহণ বা পরিত্যাগ করব। তার পর ধরা হাতটা নাড়া দিয়ে আবার বলল, কি বলবে তো?

রফিক তার হাতে চুমো খেয়ে বলল, মাই ডিয়ার সুইট হার্ট, আমাকে এত নির্দয় ভেবো না, তোমার স্বাধীনতা হরণ করে তোমাকে ক্রীতদাসী করে রাখব? তবে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্ত্রীদের যতটা স্বাধীনতা আল্লাহপাক দিয়েছেন ততটা তুমি পাবে, তার বেশি নয়। তোমার কথা শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি। চল এবার বাসায় যাই।

গাড়ি থেকে নেমে লিজাকে সাথে করে রফিক বাসায় ঢুকে দরজার বাইরে থেকে মা বলে ডাকল।

কুলসুম বিবি রান্নার কাজ সেরে জোহরের নামায পড়ে ওদেরই অপেক্ষায় রয়েছেন। রফিকের গলা শুনতে পেয়ে তাড়াতড়ি দরজার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, এই যে বাবা।

রফিক লিজাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। ওর দেখাদেখি লিজাও সালাম করল।

কুলসুম বিবি দুম্বজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, আজ যদি তোর আব্বা বেঁচে থাকত, তারপর কথাটা শেষ করতে পারলেন না, কান্নায় গলা বুজে এল। সামলে নিয়ে ভিজে গলায় দোম্বয়া করলেন–

'হে রাব্বুল আম্বলামিন, তুমি এদেরকে কবুল কর। তুমি অসীম করুণাময় ও ক্ষমাশীল। আমাদের সবাইকে তুমি ক্ষমা করে দিয়ে আমাদের উপর এবং সারা মাখলুকের উপর তোমার করুণার ধারা বর্ষণ কর। তুমি আমার কলিজার টুকরাসম এই দুম্বজনের জীবন সুখময় ও শান্তিময় করে দাও। আমাদেরকে তোমারও তোমার হাবিবে পাকের প্রদর্শিত পথে কায়েম রাখ। তোমার প্রিয় রাসুল (দঃ)-এর শানে হাজার হাজার দরূদ ও সালাম পেশ করছি। তুমি আমাদের দোম্বয়া কবুল কর। আমিন ম্ব ওরাও বলল-আমিন।